বুনিয়াদী-শিক্ষা-পদ্ধতি

বিজয়কুমার

ও

সাধনা

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি

৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি
৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

দাম দুই টাকা

মুদ্রাকর :
শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক
সাধারণ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
১৫এ, ক্ষুদিরাম বসু রোড, কলিকাতা-৬

বুনিয়াদী শিক্ষার কাজে আমাদের সমস্ত সহকর্মীদের হাতে বইখানি দিলাম।

ভূমিকা

আমাদের বিভিন্ন সময়ের লেখা কয়েকটি প্রবন্ধ একত্র করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হল। প্রবন্ধগুলি সমস্তই ইতিপূর্বে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

প্রবন্ধগুলিতে প্রধানত বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যাবহারিক দিকটার সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। যেসকল কর্মী বুনিয়াদী শিক্ষার ক্ষেত্রে কাজ করেছেন প্রবন্ধগুলি তাঁদের কাছে খানিকটা সহায়তা করতে পারে, এই ভরসাতেই এগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে সাহসী হয়েছি।

প্রবন্ধগুলি যেভাবে প্রকাশিত হয়েছিল সেইভাবেই মুদ্রিত করা হল। ভিন্ন ভিন্ন সময়ের লেখা বলে প্রবন্ধগুলির মধ্যে অনেক পুনরুক্তি আছে। দুই এক জায়গায় একটু অসামঞ্জস্য থাকতে পারে। অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মতও একটু আধটু বদলেছে, এ তারই পরিচয়।

বিজয়কুমার
সাধনা

সূচীপত্র

—এক—

বুনিয়াদী শিক্ষা

শিক্ষার লক্ষ্য মানুষ-তৈয়ারি। শিক্ষার ভিতর দিয়েই জাতি গঠিত হয়। আমাদের প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী যে আমাদের জাতীয় জীবনের উপযোগী নয় এ কথা সর্বজনস্বীকৃত। ইংরেজ নিজের প্রয়োজনে এই শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্তন করেছিল। ভারতবাসীকে একটা স্বাধীন জাতি স্বরূপে গড়ে তোলা তার লক্ষ্য ছিল না। তার লক্ষ্য ছিল এমন একদল লোক সৃষ্টি করা যারা রক্তমাংসে ভারতীয় হলেও চালচলন এবং আচারব্যবহারে ইংরেজেরই মত হবে। তাদের মনটা ইংরেজের অনুকূল হবে এবং তারা ইংরেজকে তার ভারতশাসনের কাজে সহায়তা করবে। ইংরেজের প্রবর্তিত শিক্ষাপ্রণালী এতদিন ধরে তাই করেছে। তাই ভারতবাসী একটা স্বাধীন জাতি স্বরূপে গড়ে উঠবে, এ যাঁরা দেখতে চান তাঁরা সকলেই প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর সংস্কারের কথা চিন্তা করেছেন। নানাদিকে নানাভাবে এর জন্য চেষ্টা চলেছে। প্রচলিত শিক্ষাধারার বাইরে শান্তিনিকেতন এবং গুরুকুলের মত নূতন নূতন শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দেশে একটা নূতন শিক্ষার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছে। তা ছাড়া প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন সাধনের চেষ্টাও মাঝে মাঝে হয়েছে। নূতন শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা না করে বর্তমান শিক্ষালয়গুলিকে নূতন রূপ দেবার ব্যবস্থা হয়েছে।

এই বিষয়ে সকলের শেষে হলেও সকলের চেয়ে বেশি চেষ্টা করেছেন মহাত্মা গান্ধী। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই জাতিকে তিনি সম্পূর্ণ নূতন করে গড়তে চেয়েছেন। শিক্ষার ক্ষেত্রেও তিনি যে

পরিবর্তন করতে চেষ্টা করেছেন তা একেবারে আমূল পরিবর্তন। তাকে শিক্ষাসংস্কার না বলে বরং শিক্ষাবিপ্লব বলা যেতে পারে। এই হিসাবে তাঁর হিন্দী শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধসংগ্রহের যে নাম দেওয়া হয়েছে তা সার্থক হয়েছে—'শিক্ষামেঁ অহিংসক ক্রান্তি', শিক্ষায় অহিংস বিপ্লব। গান্ধীজীর প্রবর্তিত এই শিক্ষাপ্রণালী আজ 'নয়ী তালিম' বা নূতন শিক্ষা নামে অভিহিত হয়েছে। এরই প্রাথমিক স্তরের নাম বুনিয়াদী শিক্ষা।

নূতন ভারত-শাসন-আইন অনুযায়ী ১৯৩৭ সালে যখন প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হল তখন কয়েকটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করল। নূতন মন্ত্রিসভার সম্মুখে দেশের অন্যান্য সমস্যার সঙ্গে বড় হয়ে দেখা দিল তার শিক্ষার সমস্যা। দেশের শতকরা ৮৮জন লোকই অশিক্ষিত। তাদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে। কেমন করে শিক্ষা দেওয়া যায় এবং কিভাবে শিক্ষা দেওয়া যায়? দরিদ্র দেশ, এই বিরাট অশিক্ষিত জনসাধারণকে শিক্ষিত করতে হলে যে অর্থের প্রয়োজন তা তার নাই। তা ছাড়া, এই শিক্ষার রূপ কি হবে? কংগ্রেসের কর্ণধার মহাত্মা গান্ধীর মনে এই প্রশ্ন উঠল এবং তিনি তাঁর নিজস্ব মৌলিক প্রথায় এর সমাধান করলেন।

পরাধীন পরাবলম্বী জাতিকে স্বাধীন এবং স্বাবলম্বী করাই কংগ্রেসের সাধনা। দেশের সমস্ত ছেলেমেয়েকে স্বাধীন ভারতের স্বাবলম্বী নাগরিকরূপে গড়ে তুলতে হবে। ছেলের শিক্ষা স্বাবলম্বী হবে এবং তারই ভিতর দিয়ে সে স্বাবলম্বী হয়ে গড়ে উঠবে। এই হল তাঁর চিন্তা। সমাজ-জীবনের প্রয়োজনীয় কোন একটা হাতের কাজ দিয়ে ছেলের শিক্ষা আরম্ভ হবে। শিক্ষার প্রথম থেকেই ছেলে কাজ করতে থাকবে এবং এই কাজের ফলে যে আয়

হবে তা থেকেই শিক্ষার ব্যয় নির্বাহিত হবে। এই শিক্ষালাভের ফলে ছেলে এমনভাবে তৈয়ারি হবে যে শিক্ষাসমাপ্তির পর তাকে জীবিকানির্বাহের জন্য পরমুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাকতে হবে না। বিদ্যালয়ে ছেলে যে কাজ শিখবে, প্রয়োজন হলে তারই সাহায্যে সে তার জীবিকানির্বাহ করতে পারবে।

দেশের শিক্ষাসমস্যা আলোচনার জন্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌দের নিয়ে ওয়ার্ধায় এক শিক্ষাসম্মেলন আহ্বান করা হল। গান্ধীজী সম্মেলনের সম্মুখে তাঁর এই মত উপস্থিত করলেন। বিস্তৃত আলোচনার পর এই মত গৃহীত হল এবং দিল্লী 'জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া'র অধ্যক্ষ ডাঃ জাকির হোসেনের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে তারই উপর শিক্ষাক্রম রচনা করার ভার দেওয়া হল। জাকির-হোসেন-কমিটি শিক্ষাক্রম রচনা করে সম্মেলনের সভাপতি গান্ধীজীর হাতে দিলেন।

হরিপুরায় কংগ্রেসের অধিবেশন। কংগ্রেসের হাতে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব এসেছে। দেশের শিক্ষার কথা তাকে ভাবতে হচ্ছে। জাতির শিক্ষাকে নূতন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং সমগ্র জাতিকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। কংগ্রেস স্থির করল, গান্ধীজীর প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিই গ্রহণ করবে। এই নীতি অনুযায়ী শিক্ষার কাজ পরিচালনার জন্য একটি নিখিল-ভারত-শিক্ষা-সমিতি গঠন করা হল। সমিতি এই নূতন শিক্ষাপদ্ধতিকে কাজে পরিণত করবেন এবং গভর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দেবেন। সমিতির পরামর্শ অনুসারে বিভিন্ন কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশে নূতন শিক্ষার কাজ সুরু হল। এই হল সংক্ষেপে বুনিয়াদী শিক্ষার ইতিহাস।

কাজের ভিতর দিয়ে শিক্ষা এবং স্বাবলম্বী শিক্ষা, এই দুটি বুনিয়াদী শিক্ষার মূল কথা।

কাজের ভিতর দিয়ে শিক্ষার অর্থ কারিগরী-শিক্ষা নয়। শিক্ষার লক্ষ্য ছেলের শরীর, মন ও আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন। পড়া ও লেখার ভিতর দিয়ে এ বিকাশ যতখানি হয় কাজের ভিতর দিয়ে হয় তার চেয়ে অনেক বেশি। সাধারণ কারিগরী-শিক্ষালয়ে ছেলেকে শুধু কাজ করতেই শেখানো হয়। এখানে কিন্তু তা হয় না। এখানে শিক্ষকের লক্ষ্য হল কাজের ভিতর দিয়ে ছেলের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের ব্যবস্থা করা। তা যদি না হয় তা হলে এ শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে বলতে হবে। অনেক বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে কাজ শেখাবার ব্যবস্থা আছে। সেখানে লেখাপড়া ও কাজ আলাদা হয়, কারও সঙ্গে কারও কোন সম্বন্ধ থাকে না। এখানে তা নয়। এখানে লেখাপড়া ও কাজের মধ্যে রয়েছে একটা অঙ্গাঙ্গী-সম্বন্ধ। কাজ হল শিক্ষার কেন্দ্র এবং সেই কেন্দ্রকে অবলম্বন করে লেখাপড়া যা কিছু সব হয়।

এই কাজের মধ্যে একটা বিশেষত্ব আছে। এ কাজ আয়কর উৎপাদনাত্মক কাজ। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে কাজের ভিতর দিয়ে শিক্ষার রীতি প্রবর্তিত হয়েছে। কিন্তু সে কাজ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উৎপাদনাত্মক কাজ নয়। তা থেকে যে জিনিস তৈয়ারি হয় তা বিক্রয় করে আয় হয় না। এই বিদ্যালয়ের কাজ সেরকম নয়। এখানকার কাজের লক্ষ্য সমাজ-জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিস তৈয়ারি করা। অর্থের দিক থেকে সে কাজের একটা মূল্য আছে এবং তা থেকে একটা আয় হয়। সেই আয় থেকে বিদ্যালয়-পরিচালনার ব্যয় নির্বাহিত হয়। এইভাবে বিদ্যালয় স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে, তার ব্যয় নির্বাহের জন্য তাকে বাইরের উপর নির্ভর করতে হয় না।

গান্ধীজী প্রধানত কর্মী লোক ছিলেন। কাজই ছিল তাঁর

জীবনের বড় কথা। পড়ার জন্যই পড়া এবং লেখার জন্যই লেখা তিনি কখনও করেন নাই। জীবনের ক্ষেত্রে কাজের জন্য যেখানে পড়া বা লেখার প্রয়োজন হয়েছে সেইখানেই পড়েছেন বা লিখেছেন। তাঁর প্রকৃতির এই বৈশিষ্ট্য তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষা-প্রণালীর মধ্যেও ফুটে উঠেছে। তাঁর যা কিছু কাজ ছিল সবই মানুষকে কেন্দ্র করে। যা করেছেন মানুষের কল্যাণের জন্যই করেছেন। কল্যাণের কষ্টিপাথরেই সব কাজের যাচাই হত তাঁর কাছে। যা মানুষের কল্যাণকর নয় তার কোন মূল্য তাঁর কাছে ছিল না। এই বিশেষত্বটিও তাঁর শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে দেখা দিয়েছে।

সমস্ত শিক্ষা-পদ্ধতির পিছনেই একটা দার্শনিক তত্ত্ব থাকে। গান্ধীজীর এই শিক্ষা-পদ্ধতির পিছনেও আছে। মানুষের জীবনের লক্ষ্য হল ভগবানকে লাভ করা। সত্য এবং অহিংসাই ভগবানের স্বরূপ। ভগবানকে লাভ করতে হলে সত্য এবং অহিংসার পথেই লাভ করতে হবে। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ না হলে সে থাকতে পারে না। তার মানবজীবনের সার্থকতাও তাকে সমাজের ভিতর দিয়েই লাভ করতে হয়। তাই তার সমাজ তার আদর্শের অনুকূল হওয়া প্রয়োজন। তার সমাজও হবে সত্য এবং অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত। সেখানে শ্রেণী এবং শ্রেণীর, মানুষ এবং মানুষের মধ্যে এই ভেদ, এই বৈষম্য থাকবে না। সকলের সঙ্গে সকলের সম্পর্ক সেখানে পরিপূর্ণ ন্যায় এবং ধর্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত হবে।

এই সমাজ গঠন করতে হলে তার মানুষকেও তেমনই করে তৈয়ারি করতে হবে, তার শিক্ষা-পদ্ধতিও সেইভাবে রচনা করতে হবে। আজ মানুষ এবং মানুষের মধ্যে এই যে বৈষম্য তার মূলে আছে শ্রম। একদল মানুষ পরিশ্রম করে না, শুধু বসে বসে

অপরের শ্রমের ফল ভোগ করে। আর একদল উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে বাধ্য হয়। মানুষ এবং মানুষের মধ্যে এই বৈষম্য যদি দূর করতে হয়, তা হলে সমস্ত সমাজকে শ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, সমাজে বসে খেতে কেউ পাবে না। এইভাবে সমাজ গড়তে হলে তার শিক্ষালয়কেও এমনইভাবে তৈয়ারি করতে হবে। সেখানেও সকলের চেয়ে বড় কথা হবে শ্রম। শিক্ষালয়ের সমাজে শ্রমের ভিতর দিয়ে শিক্ষালাভ করতে করতে ছেলে পরিশ্রমকে সম্মান করতে শিখবে, পরিশ্রমে অভ্যস্ত হবে, এবং পরবর্তীকালে যখন বড় হবে তখন শ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজকে আনন্দের সঙ্গে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারবে।

সমাজের দিক থেকে এই শিক্ষায় অনেকগুলি লাভ আছে। আজ সমাজে সর্বত্রই শারীরিক শ্রমের উপর একটা ঘৃণা আছে, শারীরিক শ্রমকে আমরা অপমানজনক বলে মনে করি। এই শিক্ষার ফলে সেই ঘৃণা দূর হবে, শারীরিক শ্রমের কাজকে কেউ ছোট কাজ বলে মনে করবে না। তা ছাড়া, আজ সমস্ত সমাজই হয়েছে লাভের ভাবে অনুপ্রাণিত এবং পারস্পরিক প্রতিযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত। সর্বত্রই কেবল সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি। কে কত অর্থ উপার্জন করবে, কে কত ধন সঞ্চয় করবে, এই নিয়ে মানুষ এবং মানুষের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা চলেছে। তার ফলে সর্বত্রই মারামারি, হানাহানি, যুদ্ধ এবং অশান্তি। এই শিক্ষার ফলে এ অবস্থার পরিবর্তন হবে। যে মানুষ সৃষ্টি করে না তারই সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি বড় হয়ে ওঠে। সাধারণ শিক্ষালয়ে সৃষ্টির কোন অবকাশ নাই। এখানে কিন্তু সৃষ্টিই হবে ছেলের বড় কাজ। তার ফলে সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি তার কমে যাবে। পড়াশোনা একলা একলা করা যায়, কিন্তু কাজ করা একলা হয় না। তার জন্য অপরের সাহায্যের

প্রয়োজন। তাই কাজ করতে গিয়ে ছেলের প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সহযোগিতার প্রবৃত্তি বাড়তে থাকবে, এবং তার ফলে তার মনে জেগে উঠবে সেবার ভাব। লাভটাই জীবনের বড় কথা হয়ে থাকবে না।

এই শিক্ষা শুধু যে সমাজের দিক থেকেই কল্যাণকর তা নয়। বালমনস্তত্ত্বের দিক থেকেও এর উপযোগিতা আছে। তা যদি না হত তা হলে সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হলেও এ শিক্ষা গ্রহণযোগ্য হত না। সাধারণ শিক্ষালয়ে ছেলেকে শুধু বসে বসে লেখাপড়া করতে হয়। কিন্তু এ তার স্বভাবের প্রতিকূল। ছেলে চায় কাজ। সে লাফাবে ঝাঁপাবে, ছুটোছুটি হুটোপাটি করবে, ভাঙ্গবে গড়বে, এই তার স্বভাব। এর ভিতরে সে যে আনন্দ পায়, বসে বসে লেখাপড়ায় সে আনন্দ সে পায় না। আর আনন্দের ভিতর দিয়েই ছেলের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়। প্রত্যেক ছেলের মনেই একটা ধ্বংসের এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে একটা সৃজনেরও আকাঙ্ক্ষা আছে। সৃষ্টির কাজ তার সেই ধ্বংসের আকাঙ্ক্ষার সংশোধক হিসাবে কাজ করে এবং তার সৃজনের আকাঙ্ক্ষাকে তৃপ্ত করে। তা ছাড়া, কাজের ভিতর দিয়ে শিক্ষাও ভাল হয়। বিনা প্রয়োজনে মানুষ কিছু শিখতে চায় না। প্রয়োজনের তাগিদেই শেখে। শুধু শিখতে চায় তাই নয়, তাড়াতাড়ি শিখতে পারে এবং যা শেখে তা মনেও থাকে ভাল। ছেলে যখন কাজ করতে করতে কাজের প্রয়োজনে শিখতে থাকে, তখন এই দিক থেকে তার সুবিধা হয়।

শিক্ষার দিক থেকেও এই শিক্ষা আমাদের প্রচলিত শিক্ষার চেয়ে অনেক বেশি উপযোগী। শিক্ষা তো কেবল লিখতে পড়তে শেখা নয়, শিক্ষা মানে জীবনের সর্বতোমুখ বিকাশ। কাজের

ভিতর দিয়ে এ যেমন হয়, পড়ার ভিতর দিয়ে তা হয় না। পড়ার ক্ষেত্রে ছেলেকে নিষ্ক্রিয়ভাবে অপরের অভিজ্ঞতার কথা গলাধঃকরণ করতে হয়। কাজের ক্ষেত্রে সে নিত্য নূতন অভিজ্ঞতা অর্জন করতে থাকে। সেখানে সে নিষ্ক্রিয় নয়, বরং পরিপূর্ণভাবে সক্রিয়। আর এই ক্রিয়াশীলতাই তো জীবন। এই শিক্ষার আর একটা গুণ, এতে ছেলের আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাজ্ঞান বেড়ে যায়। কাজ করতে করতে এবং কাজের ভিতর দিয়ে রোজগার করতে করতে ছেলের মনে এই বিশ্বাস জেগে ওঠে যে, সেও আর পাঁচজনের মত নিজে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, অপরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকার প্রয়োজন তার নাই। সে যে শিক্ষাকে অপরের দান হিসাবে গ্রহণ করছে না, নিজের শ্রমের মূল্যে সে যে শিক্ষাকে অর্জন করে নিচ্ছে, এই জ্ঞান থেকে তার আত্মমর্যাদাজ্ঞানও বেড়ে যায়। যে কাজ সে করে, তার ফল সে একা ভোগ করে না, তার ফল ভোগ করে সমগ্র শিক্ষালয়-সমাজ। এর ফলে ত্যাগ এবং সেবার পথে তার মনটা তৈয়ারি হয়ে ওঠে। এর চেয়ে বড় শিক্ষা আর আমরা ছেলেকে কেমন করে দেব?

আর্থিক দিক থেকেও এই শিক্ষার একটা মস্ত উপযোগিতা আছে। আমাদের এই দরিদ্র দেশে অর্ধেকের বেশি লোক দুবেলা পেট ভরে খেতে পায় না। ভারতবাসীর গড়পড়তা মাথা পিছু আয় দৈনিক ॥৴০ আনা। এখানে একটা পয়সাও যার থেকে আয় হয়, তারও দেশের দিক থেকে একটা মূল্য আছে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষাকাল সাত বৎসর; ছেলের বয়স সাত থেকে চৌদ্দ। এই বয়সের ছেলের সংখ্যা সাধারণত সমগ্র জনসংখ্যার আট ভাগের এক ভাগ হয়ে থাকে। সাধারণ বিদ্যালয়ে এরা এক পয়সাও রোজগার করে না। কিন্তু বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে এরা

মাথাপিছু গড়ে একটা টাকা মাসে অনায়াসেই রোজগার করতে পারবে। সমগ্র ভারতের লোকসংখ্যা যদি ৪০ কোটি হয় এবং সর্বত্রই যদি বুনিয়াদী শিক্ষার প্রর্বতন করতে পারা যায়, তা হলে এই ছেলেরা সারা বছরে ৬০ কোটি টাকা উপার্জন করবে। এই গরীব দেশে এর কি মূল্য, তা আমরা সকলেই জানি।

বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তন হয়েছে অতি অল্পদিন। জিনিসটা একেবারে নূতন, আমাদের প্রচলিত ধারণার সম্পূর্ণ বিরোধী। এইরকম জিনিসকে বুঝতে সময় লাগে, আমাদেরও লাগছে। সেইজন্য আমাদের শিক্ষাবিদ্‌দের মনে এখনও এই শিক্ষার সম্বন্ধে একটা সংশয় রয়ে গেছে। তাঁরা ভাবছেন, এই শিক্ষায় লেখাপড়া কতটুক্ হবে এবং কেমন করে হবে? ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্রের বিকাশ না হয় হল, কিন্তু লেখাপড়াও তো চাই। তা যদি না হয় তো শিক্ষা কি হল? লেখাপড়া সত্যই চাই। লেখাপড়ার জন্যই নয়, জীবনের জন্যও লেখাপড়ার প্রয়োজন। এবং তার ব্যবস্থা এই শিক্ষার মধ্যে সম্পূর্ণই আছে। আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার মান হবে বর্তমান ম্যাট্রিকুলেশনের মত ইংরেজী বাদে, এই ছিল গান্ধীজীর মত। সাত বৎসরে এতখানি সম্ভব কিনা, এই একটা প্রশ্ন হতে পারে। সাত বৎসরে যদি না হয়, সাত বৎসরের বেশিই লাগবে। গান্ধীজী বলেছেন, সাত বৎসরটা তাঁর শিক্ষা-পরিকল্পনার একটা অপরিহার্য অঙ্গ নয়। তবে, সাত বৎসরেই এটা সম্ভব, এই মনে করে সাত বৎসরের কথা বলা হয়েছে। মাতৃভাষার মাধ্যমে পড়ানো হবে এবং ইংরেজী পড়ানো হবে না, এই যদি হয় তো সাত বৎসরে হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

বুনিয়াদী শিক্ষায় কাজকে অবলম্বন করে শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু কাজকে অবলম্বন করে সমস্ত শিক্ষণীয় বিষয় কি শেখানো

যায়, এই আর একটা প্রশ্ন। একটা মাত্র কাজকে অবলম্বন করে সব শেখানো যায় না, এ কথা খুবই সত্য। কাজ একাধিক হতে পারে এবং তা হওয়াই দরকার। ছেলেকে যথাসম্ভব স্বাধীন এবং স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা যদি শিক্ষার লক্ষ্য হয় তাহলে একাধিক কাজই তাকে করতে হবে। অন্ন বস্ত্র এবং গৃহ, মানুষের জীবনের সব চেয়ে বড় প্রয়োজন এই তিনটি। এই তিনটিই ছেলে করতে শিখবে। এর জন্য ছেলেকে কৃষি ও পশুপালন, সুতাকাটা ও কাপড় বোনা এবং কাঠের ও লোহার কাজ শিখতে হবে। এর মধ্যে কোন এক ক্ষেত্রে কোন একটির উপর জোর বেশি পড়বে, কিন্তু বাকিগুলি একেবারে বাদ যাবে না। গেলে চলবেও না। তা ছাড়া, শুধু কাজই নয়। কাজকে উপলক্ষ করে আরও অন্য জিনিস এসে পড়বে। কাজ মানে কি ? আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশকে সামাজিক পরিবেশের অনুকূল করে গড়ে তোলাই তো কাজ। আমাদের সামাজিক পরিবেশে কাপড়ের প্রয়োজন। প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে তুলা আছে। তাকে নিয়ে কাপড়ে পরিণত করতে হবে। সব কাজই তো মূলত এই। সুতরাং কাজের সঙ্গে সঙ্গে ছেলের প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশও আসবে, এবং তাকে অবলম্বন করেও শিক্ষা চলতে থাকবে। প্রকৃতিকে অবলম্বন করে বিজ্ঞানের বিবিধ বিষয় এবং সমাজকে অবলম্বন করে বিভিন্ন সমাজ-বিদ্যা, যেমন ইতিহাস, ভূগোল, পৌরনীতি, সবই এসে পড়বে। বলতে গেলে, ছেলের সমস্ত জীবনই হবে শিক্ষার বিষয়ীভূত। সেইজন্যই বলা হয়েছে, বুনিয়াদী শিক্ষা জীবনের ভিতর দিয়ে জীবনের শিক্ষা।

এইখানেই বুনিয়াদী শিক্ষার একটা বড় বৈশিষ্ট্য। আমাদের প্রচলিত শিক্ষার জীবনের সঙ্গে কোন যোগ নাই। সেইজন্য শিক্ষার

দ্বারা জীবন যেভাবে সমৃদ্ধ হওয়া উচিত আমাদের দেশে তা হয় না। জীবনের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে বলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের শিক্ষা ব্যর্থ হয়ে যায়, জীবনের কাজে লাগে না। শিক্ষাকে যদি প্রকৃতই জীবনের কাজে লাগাতে হয়, তা হলে জীবনের সঙ্গে তার একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা প্রয়োজন। বুনিয়াদী শিক্ষায় তা থাকে। আর, তা থাকে বলেই শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষিতের জীবন ক্রমশ পূর্ণতর এবং সমৃদ্ধতর হতে থাকে। তার ফলে সমগ্র শিক্ষালয় এবং সমস্ত সমাজ এর দ্বারা উপকৃত হয়। সেইজন্যই আজ দেখতে পাই, যেখানে বুনিয়াদী শিক্ষা সাত বৎসর ধরে চলেছে সেইখানেই এই শিক্ষার ফলে শুধু ছাত্র নয়, শিক্ষক এবং সমাজও ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে।

আমরা আজ স্বাধীনতা লাভ করেছি। আমাদের ভবিষ্যদ্‌-বংশীয়দের স্বাধীন দেশের স্বাধীন সমাজের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে। তার জন্য উপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজন। ইংরেজ যে শিক্ষার প্রবর্তন করেছিল তা গোলামের শিক্ষা। মানুষ হুকুম শুনবে এবং হুকুম তামিল করবে, এই ছিল তার লক্ষ্য। তাই নিষ্ক্রিয়তাকেই সে বড় স্থান দিয়েছে তার শিক্ষার মধ্যে। আজ আমরা এমন মানুষ চাই যারা কাজ করবে এবং কাজের ভিতর দিয়ে দেশকে নূতন করে গড়ে তুলবে। আমরা চাই স্বাধীন এবং সক্রিয় নাগরিক। তারা শুধু হুকুম তামিল করবে না, হুকুম করতে শিখবে। এই শিক্ষা একমাত্র কাজের ভিতর দিয়েই হতে পারে।*

---

* বর্তমানে বুনিয়াদী শিক্ষার সময় বাড়িয়ে সাত বৎসরের জায়গায় আট বৎসর করা হয়েছে।

—দুই—

বুনিয়াদী-শিক্ষা-পদ্ধতির গোড়ার কথা

শিক্ষার লক্ষ্য জীবন গঠন। আমরা যখন ছেলেকে শিক্ষা দিই, তখন সেই শিক্ষার ভিতর দিয়ে তার জীবনকে একটা বিশেষ আদর্শ অনুসারে গড়ে তুলবার চেষ্টা করি। সেইজন্য প্রকৃত শিক্ষার জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকবে। জীবনের সঙ্গে যার সম্বন্ধ নাই, সে শিক্ষা শিক্ষা নয়। ছেলের জীবনকে তৈয়ারি করতে হলে জীবনের ভিতর দিয়েই তা করতে হবে। বই পড়িয়ে বা উপদেশ দিয়ে জীবনকে তৈয়ারি করা যায় না।

জীবন মানেই কাজ। মানুষকে একটা বিশেষ প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যে একটা বিশেষ সমাজে বাস করতে হয়। বাঁচবার জন্য তাকে নিজেকে সেই অবস্থার এবং সেই সমাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। যেখানে সম্ভব মানুষ তার পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক অবস্থা বা সমাজকে তার মত করে গড়ে নেয়। যেখানে সে তা পারে না, সেখানে তার নিজেকেই পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা সমাজের মত করে বদ্‌লে নিতে হয়। তা না হলে মানুষ বাঁচতেই পারে না। এই যে প্রাকৃতিক ও সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান, এরই উপর জীবন নির্ভর করছে। এই সামঞ্জস্য বিধান হয় কাজের মধ্য দিয়ে। তাই জীবনের ভিতর দিয়ে শিক্ষার অর্থ, কাজের ভিতর দিয়ে শিক্ষা। বুনিয়াদী শিক্ষাও কাজের ভিতর দিয়ে শিক্ষা।

জীবনের জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন। কিভাবে জীবন যাপন করব, কিভাবে নিজেদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন

করব, এইটা স্থির করবার জন্য চাই জ্ঞান। না জানলে কেমন করে করব? কিন্তু এই যে জ্ঞান, এ কোথা থেকে আসবে? জ্ঞান মানুষ প্রধানত লাভ করে তার অভিজ্ঞতা, ইংরেজীতে যাকে বলে experience তার ভিতর দিয়ে। কিন্তু মানুষের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। নির্দিষ্ট স্থান এবং নির্দিষ্ট কালের বাইরে এই অভিজ্ঞতা যেতে পারে না। তা ছাড়া, অভিজ্ঞতার ক্ষমতাও সকলের সমান নয়। তাই নিজের নিজের অভিজ্ঞতার অসম্পূর্ণতা অপরের অভিজ্ঞতা দিয়ে পূর্ণ করে নিতে হয়। আমি যা জানি না বা জানতে পারি না, অপরে তা জানে এবং জানতে পারে। সেইজন্য আমাকে অপরের সাহায্য নিতে হয়। হয় তার কথা শুনতে হয়, আর না হয় তার লেখা পড়তে হয়। উপদেশ অথবা বই, এরই ভিতর দিয়ে আমরা অপরের অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত হই।

নিজের জ্ঞানের সম্পূর্ণতা সাধনের জন্য আমাদের অপরের অভিজ্ঞতার সাহায্য নিতে হয়। অপরের অভিজ্ঞতার মূল্য আমরা তখনই বুঝতে পারি, যখন তার পিছনে আমাদের নিজের অভিজ্ঞতা থাকে। নিজের অভিজ্ঞতা দিয়েই আমাদের অপরের অভিজ্ঞতা বুঝতে হয়। অন্যের কথা শুনে বা বই পড়ে জ্ঞান লাভ করতে হলে তার পূর্বে নিজস্ব অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। সেইজন্য বিশেষ করে শিশুর শিক্ষায় উপদেশ বা বইয়ের উপর নির্ভর না করে অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করাই উচিত। ছেলেমেয়ে জীবনের ক্ষেত্রে কাজ করবে, কাজের ভিতর দিয়ে তার অভিজ্ঞতা হবে, সেই অভিজ্ঞতার সাহায্যে সে শিক্ষা লাভ করবে।

যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন মানুষের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে মানব-সমাজের জ্ঞানের ভাণ্ডার গড়ে উঠেছে। ভাণ্ডারে

জিনিস গুছিয়ে রাখতে হয়। তা না হলে কাজের সময় খুঁজে পাওয়া যায় না। ভাণ্ডারে জিনিস থাকলেও সে জিনিস কাজে লাগে না। তাই মানুষকেও তার জ্ঞানভাণ্ডারের বিচিত্র উপকরণগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে সাজিয়ে নিতে হয়েছে। এর এক একটি ভাগ নিয়ে হয়েছে এক একটি বিদ্যা।

উদ্ভিদের সম্বন্ধে যে জ্ঞান তা উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, প্রাণীর সম্বন্ধে যে জ্ঞান তা প্রাণিবিদ্যা। তেমনই শরীরবিদ্যা, মনোবিদ্যা ইত্যাদি। এই যে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত বিভিন্ন বিদ্যা, এ হল বয়স্ক মানুষের পরিণত মনের সৃষ্টি। ছোট ছেলের কাছে এর কোন অর্থ নাই। তার ক্ষুদ্র জীবনের যে স্বল্প অভিজ্ঞতা তা এক এবং অখণ্ড। এর মধ্যে কতখানি কোন্ বিদ্যার মধ্যে পড়ে, তা সে জানেও না, জানতে চায়ও না। যত দিন যায়, যত তার বয়স বাড়তে থাকে এবং তার অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের ভাণ্ডার যতই বেশি হয়, ততই সে মনে মনে এই জ্ঞানকে বিভিন্নভাবে সাজাবার চেষ্টা করে। তার কাছে বিভিন্ন বিদ্যাগুলি তখন সত্য হয়ে ওঠে।

এ সমস্তই সাধারণ কথা। বুনিয়াদী শিক্ষাও একটা অসাধারণ কিছু নয়। শিশুর জীবনে যা সাধারণ সত্য, বুনিয়াদী শিক্ষা তারই উপরে প্রতিষ্ঠিত একটা শিক্ষা-পদ্ধতি। প্রচলিত শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সত্যগুলিকে স্বীকার করে নিয়ে সেগুলিকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করা হয়নি ; বুনিয়াদী শিক্ষায় তা হয়েছে, এই মাত্র। সেই হিসাবে বুনিয়াদী-শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির তুলনায় একটা বৈশিষ্ট্য এসে গেছে। বুনিয়াদী-শিক্ষা-পদ্ধতিকে বুঝতে হলে এই বৈশিষ্ট্যগুলির দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। সেই বৈশিষ্ট্যগুলি এই।

ছেলের জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশই হবে শিক্ষার লক্ষ্য। তাকে যা কিছু শেখানো হবে তা যেন সমভাবে তার দেহ মন ও প্রাণের পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়তা করে, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে চলতে হবে। শিক্ষার ভিতর দিয়ে ছেলে দিনের পর দিন তার দেহ মন ও প্রাণের ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। এ যদি না হয়, তা হলে শিক্ষা ব্যর্থ হল বলে মনে করতে হবে।

ছেলের এই যে বিকাশ, তা হবে তার জীবনের কাজের ভিতর দিয়ে। বিদ্যালয় হবে বাহিরের সমাজের অনুরূপ একটি সমাজ। দুইয়ের মধ্যে তফাত এই যে, বাহিরের সমাজ বয়স্কদের সমাজ, বিদ্যালয়ের সমাজ ছোটদের জন্য, তাদেরই মত করে তৈয়ারি সমাজ। ছেলে এই সমাজের ভিতরে থেকে তার সমাজ-জীবন যাপন করতে করতে বাহিরের সমাজের জন্য প্রস্তুত হবে। সেইজন্য শিক্ষককে ভাল করে বিদ্যালয়ের সমাজ গঠনে যত্নবান হতে হবে। তাঁকে দেখতে হবে, বাহিরের বৃহত্তর সমাজের মত বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র সমাজটিও যেন বিভিন্ন কর্তব্য এবং অধিকারের মধ্যে বিচিত্ররূপে রূপায়িত হয়ে ওঠে।

বিদ্যালয়ের সমাজে সমাজ-জীবন যাপনের ভিতর দিয়ে ছেলের যে অভিজ্ঞতা হবে, সেইটিই হবে তার শিক্ষার প্রধান উপজীব্য। সমাজ-জীবনে দৈনন্দিন কাজের ভিতর দিয়ে ছেলে তার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে থাকবে। এই অভিজ্ঞতা হবে এক এবং অখণ্ড। শিক্ষার ক্ষেত্রে ছেলে যেমন অগ্রসর হতে থাকবে, তেমনই তার এই ক্রমসঞ্চিত অভিজ্ঞতা বহুধা বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন বিদ্যার রূপ গ্রহণ করবে। ছেলের নিজের অভিজ্ঞতায় তার জ্ঞানের ভাণ্ডার খানিকটা পূর্ণ হলে পরে তাকে পূর্ণতর করবার জন্য ছেলেকে বই প্রভৃতির ভিতর দিয়ে সমাজের

সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডারের সন্ধান দিতে হবে এবং এই জ্ঞানভাণ্ডারকে কাজে লাগাবার মত করে তাকে তৈয়ারি করতে হবে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, শিক্ষা জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হবে, জীবনের কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হবে এবং শিক্ষা এক অখণ্ড অভিজ্ঞতার রূপ গ্রহণ করবে।

—তিন—

বুনিয়াদী শিক্ষায় কাজের স্থান

(সাধারণ বিদ্যালয়ের মত বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে বইয়ের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয় না। এখানে কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়। বইয়ের বদলে কাজকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার সুবিধা কোথায় তা বুঝতে হলে শিক্ষার উদ্দেশ্য কি তা বুঝতে হয়।

শিক্ষার উদ্দেশ্য জীবন গঠন, শুধু লেখাপড়া নয়। কিন্তু সাধারণ বিদ্যালয়ে ছেলেকে লেখাপড়া শেখানো ছাড়া আর বেশি কিছু করা হয় না। সেখানে ছেলে লিখতে পড়তে হিসাব করতে শেখে এবং ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ে খানিকটা জ্ঞান লাভ করে। ছেলের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের দিকে কোন লক্ষ্যই রাখা হয় না। ফলে শিক্ষার উদ্দেশ্য সেখানে ব্যর্থ হয়ে যায়।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ছেলের জীবন গঠনের দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষা দেওয়া হয়। জীবন মানেই কাজ, সুতরাং জীবন গঠন করতে হলেই কাজের কথা ভাবতে হয়। তাই বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কাজের প্রবর্তন করা হয়েছে এবং কাজের মাধ্যমেই ছেলেকে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

কাজ ছেলের প্রকৃতির অনুকূল। ছোট ছেলে চুপ করে বসে পড়তে ভালবাসে না। কাজ করতে দিলেই তার আনন্দ। সুতরাং কাজের মাধ্যমে শিক্ষাকে সে সহজে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে) সাধারণ বিদ্যালয়ে ছেলে খানিকক্ষণ পড়লেই ক্লান্তি বোধ করে। তাই সেখানে ছেলের আগ্রহ বজায় রাখার জন্য ঘণ্টায় ঘণ্টায়

পাঠের বিষয়বস্তু পরিবর্তনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও ছুটির ঘণ্টা বাজলে বা বিদ্যালয়ে ছুটি থাকলে ছেলের মনটা যেন খুশী হয়ে ওঠে। কিন্তু দেখা গেছে, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছেলেরা বিদ্যালয়ে ছুটি থাকলেই কষ্ট বোধ করে। অনেক সময় এমনও হয়েছে, ছুটির ঘণ্টা বেজে গেছে, শিক্ষক যাবার জন্য তাড়া দিচ্ছেন, তা সত্ত্বেও ছেলে কাজ ছাড়তে চায় না। টিফিনের সময় তো এমন ঘটনা বহুদিন ঘটে, ছেলে কাজ ছেড়ে খেতে যাবে না। শিক্ষককে জোর করে তাকে খেতে পাঠাতে হয়।

আনন্দের দিক ছাড়াও কাজের মধ্য দিয়ে ছেলের চরিত্রের বিকাশ ভাল হয়। বই একলা বসেও পড়া যায়। কিন্তু কাজ করতে গেলেই পাঁচজনের সংস্রবে আসতে হয়। পাঁচজনের সঙ্গে কাজ করার ফলে ছেলে সামাজিক হয়ে ওঠে। পাঁচ-জনের সঙ্গে কাজ করতে করতে পরস্পরের মতকে সহ্য করবার শিক্ষা ছেলের হয়। কাজের শেষে কাজ কেমন হল না হল, সেই সম্বন্ধে আলোচনা হয়। কাজের মধ্যে ত্রুটিবিচ্যুতি কিছু না কিছু থাকেই। তারও আলোচনা হয়। ছেলেবেলা থেকে নিজের ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন হলে অন্যের দোষ ধরার প্রবৃত্তি কমে যায়। ছেলে ক্রমে সহিষ্ণু হয়ে ওঠে।

কাজের জিনিস গোছানো না থাকলে কাজের অসুবিধা হয়। সর্বদা নিজের কাজের সরঞ্জাম গুছিয়ে রাখার ফলে গোছানো ছেলের অভ্যাস হয়ে যায়। একটা ক্ষেত্রে গোছানো একবার অভ্যাস হয়ে গেলে অন্য বিষয়ে বেগোছ হতে মানুষ ভালবাসে না।

কাজ করবার ফলে ছেলের আত্মবিশ্বাস বাড়ে। কাজকে সে ভয় করে না। কাজের মধ্য দিয়ে ছেলের দায়িত্ববোধ জাগে। দেখা

গেছে, ছেলেরা দৈনিক কাজের পরিকল্পনা করে সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী নিজেরাই কাজ করে যায়। কাজের পরিকল্পনা টাঙানো থাকলেই হল। শিক্ষক উপস্থিত না থাকলেও কোন অসুবিধা হয় না। এমনও দেখা গেছে, শিক্ষকের বিদ্যালয়ে পৌঁছতে দেরি হয়েছে। এসে দেখেন, ছেলেরা ঘণ্টা দিয়ে প্রার্থনা করে নিয়ে নিজের নিজের শ্রেণীতে বসে গিয়েছে। বিদ্যালয়ের অধিনায়ক পরিকল্পনা অনুযায়ী সমস্ত শ্রেণীতে কাজ আরম্ভ করিয়ে দিয়েছে। নাম ডাকা থেকে আরম্ভ করে কাজের হিসাব রাখা, লাইব্রেরির বই দেওয়া নেওয়া, বিদ্যালয় সাফ করা ইত্যাদি সব কাজই ছেলেরা দায়িত্ব নিয়ে করে।

প্রত্যেক কাজের আগে ছেলেকে পরিকল্পনা করতে হয়। পরিকল্পনা করতে গেলেই চিন্তার প্রয়োজন হয়। এর ফলে ছেলের চিন্তাশক্তির বিকাশ হয়। পরিকল্পনা করে কাজ করতে করতে কাজও ছেলে গুছিয়ে করতে শেখে।

কাজ যে কেবলমাত্র ছেলের চরিত্রগঠনের সহায়তা করে তাই নয়, কাজের মধ্য দিয়ে লেখাপড়া শেখালে লেখাপড়াও ভাল হয়। ছেলে প্রয়োজনের তাগিদে স্বাভাবিকভাবে শেখে এবং সহজে শিখতে পারে।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক নাই। কিন্তু তা বলে যে ছেলে পড়ে না, তা নয়। প্রত্যেক কাজের আগে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করা এবং প্রয়োজনবোধে পড়া হয়। তারই উপরে ভিত্তি করে ছেলেরা কাজের পরিকল্পনা তৈয়ারি করে নিজের নিজের খাতায় লিখে নেয়। কাজের শেষে কাজের বিবরণ লেখে। এইভাবে বিভিন্ন কাজকে উপলক্ষ করে লেখা এবং পড়া দুইই হয়।

কাজ করতে করতে বিভিন্ন সমস্যার উদ্ভব হয়। সেইসব

সমস্যার সমাধান উপলক্ষে ঐ বিষয়ে অভিজ্ঞ লোকের লেখা পড়ে। উদাহরণস্বরূপ একদিনের কথা বলা যেতে পারে।

একবার ঠিক হল, প্রত্যেক রবিবারে ছেলেরা বিদ্যালয়ে এসে নিজেদের কাপড় কেচে নেবে। তখনই কাপড় কাচা সম্বন্ধে আলোচনা সুরু হল। কোন্ কোন্ জিনিসে কাপড় কাচা যায়, প্রথমে সেই সম্বন্ধে আলোচনা হল। শিক্ষকের উপদেশে ছেলেরা বই থেকে সেই বিষয়ে পড়ে নিল।

বইয়ে আছে, কঠিন জলে কাপড় ভাল পরিষ্কার হয় না। স্থানীয় জল পরীক্ষা করে দেখা গেল, সেই জল কঠিন। তখন কঠিন জলকে কোন্ কোন্ উপায়ে নরম করে নেওয়া যেতে পারে সেই বিষয়ে পড়া হল এবং একটি উপায় ঠিক করে নেওয়া হল। কাপড় কাচার উপকরণের খরচ হিসাব করে কোন্‌টি ব্যবহার করলে অপেক্ষাকৃত কম খরচে হতে পারে তারও হিসাব করা হল। তার পরে কাপড় কাচা হল।

কাচতে কাচতে দেখা গেল, কারও কারও কাপড়ে দাগ আছে। দুই একটি দাগ ওঠে না। তখন কেমন করে বিভিন্ন রকমের দাগ তোলা যায় সেই সম্বন্ধে পড়া হল। এই প্রসঙ্গে কয়েকটা অ্যাসিডের সঙ্গেও ছেলের পরিচয় হল।

ছেলেদের তৈয়ারি জিনিস, যেমন পাঁজ খদ্দরের কপড় ইত্যাদি, ছেলেদেরই বিক্রি করতে হয়। ছেলেদের শিক্ষার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, যেমন কাগজ পেন্সিল ইত্যাদি, বিক্রি করবার ব্যবস্থা বিদ্যালয়েই থাকে। মাল ক্রয়-বিক্রয় উপলক্ষে ছেলেদের হিসাব করতে হয়। এই ধরণের বিভিন্ন কাজের মধ্যে দিয়ে অঙ্ক ছেলেদের কাছে ব্যাবহারিক ভাবেই এসে পড়ে।

অন্যান্য কাজের মত উৎসব পালনও বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের একটি

কাজ। প্রত্যেকটি উৎসব উপলক্ষে ছেলেরা সেই বিশেষ উৎসব সম্বন্ধে আলোচনা করে, পড়ে এবং লেখে। আবৃত্তি গান অভিনয় উৎসব পালনের অঙ্গ। যেমন, কোন মহাপুরুষের জন্মোৎসব পালন উপলক্ষে তাঁর জীবনী আলোচনা করা হয়। কোন ভাল বই থেকে তাঁর সম্বন্ধে গল্প কবিতা প্রভৃতি পড়া হয়। কবিতা গান অভিনয় শিখতে গেলেই নিজের নিজের খাতায় লিখে নিতে হয়।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে, পাঠ্যপুস্তক না থাকা সত্ত্বেও লেখাপড়া সাধারণ বিদ্যালয়ের চেয়ে কিছুমাত্র কম হয় না। বরং প্রয়োজনের তাগিদে শেখা হয় বলে সব জিনিসই আপনা-আপনি ছেলের মনে থেকে যায়। কোন জিনিসই তাকে বসে মুখস্থ করতে হয় না।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কাজের মূল্য তাই এত বেশি।

—চার—

বুনিয়াদী শিক্ষা ও বই

প্রচলিত শিক্ষার সঙ্গে বুনিয়াদী শিক্ষার একটা বড় পার্থক্য এই যে, প্রচলিত শিক্ষা পুস্তককেন্দ্রিক এবং বুনিয়াদী শিক্ষা কর্মকেন্দ্রিক। প্রচলিত শিক্ষায় বইকে অবলম্বন করে শিক্ষা দেওয়া হয়, বুনিয়াদী শিক্ষায় কাজকে অবলম্বন করে। এর থেকে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে বুনিয়াদী শিক্ষায় কি তা হলে বইয়ের কোন প্রয়োজন নাই? যদি থাকে তা হলে তার স্থান কোথায়? ছেলেকে কি পড়তে শেখাতে হবে না? যদি হয় কেমন করে হবে?

শিক্ষা মানে লেখাপড়া নয়, এ কথা ঠিক। শিক্ষা ছেলের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ। লেখাপড়া না হলে যে এই বিকাশ একেবারেই হতে পারে না এমন নয়। তবে, লেখাপড়া যে এই বিকাশের অনেকখানি সহায়তা করে, এও সত্য। মানুষের বিকাশ হয় তার পরিবেশের প্রভাবে। যে মানুষ লেখাপড়া জানে না তার পরিবেশ দেশকালের একটা সংকীর্ণ সীমার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। সে প্রত্যক্ষভাবে যা দেখে এবং শোনে তার বাহিরে সে বেশি দূর যেতে পারে না। দেশের দিক থেকে বা কালের দিক থেকে তার হাতের কাছে যেটুকু আছে, তার নিকট এবং বর্তমান, এই নিয়ে তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। কিন্তু লেখাপড়া শেখার সঙ্গে সঙ্গেই দূর এবং অতীত তার কাছে নিজেকে মেলে ধরে, তার পরিবেশ বহুগুণে বিস্তৃত হয়ে যায়। কাজেই ছেলের পরিপূর্ণ বিকাশ আমাদের লক্ষ্য হলেও তার জন্যই আমাদের তাকে লেখাপড়া শেখাতে হবে।

তা ছাড়া, আজকালকার সমাজে লেখাপড়ার প্রয়োজন আগের চেয়ে অনেক বেশি বেড়েছে। আগেকার দিনে আমাদের সমাজ ছোট ছিল। সেখানে প্রত্যক্ষভাবেই সকলের সঙ্গে সকলের যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হত। অন্তত প্রাত্যহিক প্রয়োজনে আজকার মত মানুষকে কথায় কথায় বাহিরে যেতে হত না। এই অবস্থা আজ বদ্‌লে গেছে। এ পরিবর্তন ভাল হয়েছে না মন্দ হয়েছে, তা নিয়ে আলোচনা করে লাভ নাই। ভালই হক আর মন্দই হক, যা হয়েছে তাকে স্বীকার করে নিয়েই চলতে হবে। আজ সমাজের বিস্তৃতি অনেক বেড়ে গেছে। মানুষকে বাঁচতে হলে আজ, সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে না হক, সমস্ত দেশের সঙ্গে অন্তত যোগাযোগ রাখতে হবে। এ যোগাযোগ প্রত্যক্ষভাবে রাখা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। লেখাপড়ার ভিতর দিয়ে ছাড়া এ যোগ রক্ষা করা যেতে পারে না। তাই লেখাপড়া আজ অনাবশ্যক বিলাস নয়, একটা অপরিহার্য প্রয়োজন।

পড়তে ছেলেকে শেখাতেই হবে, এবং পড়তে শেখাবারএকমাত্র উপায় ছেলেকে পড়তে দেওয়া। এখন, কি পড়তে দেওয়া হবে এবং কিভাবে পড়তে দেওয়া হবে, সেইটাই হল প্রশ্ন। সাধারণ বিদ্যালয়ে প্রথম থেকেই বই পড়তে দেওয়া হয় এবং যেভাবে পড়তে দেওয়া হয় তাও আমরা জানি। কিন্তু বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে তো তা হবে না।

বুনিয়াদী শিক্ষা জীবনের ভিতর দিয়ে শিক্ষা। মার্কিনশিক্ষাবিদ আর্থার ই. মর্‌গানের ভাষায় বুনিয়াদী শিক্ষা হচ্ছে learning through the normal course of living a full life as a member of a normal community। এখানে ছেলে যা কিছু

শিখবে তার জীবনের প্রয়োজনে শিখবে। কাজেই পড়তে হলেও প্রয়োজনের তাগিদে পড়বে, এই হওয়া উচিত। সেইজন্য ছেলের প্রথম পড়া সুরু হবে তার প্রতিদিনের জীবনকে অবলম্বন করে। প্রথমেই তাকে দিনের হিসাব রাখতে হবে। তার জন্য বার তারিখ লিখতে এবং পড়তে শিখতে হবে। প্রতিদিনই তার কিছু না কিছু কাজ আছে। সেই কাজের পরিকল্পনা করতে হবে, সরঞ্জাম হিসাব করে আনতে হবে ও কাজ হয়ে গেলে আবার গুছিয়ে রাখতে হবে, এবং কাজের শেষে কি কাজ হল, কতখানি কাজ হল, তার হিসাব রাখতে হবে। এইসব কাজ উপলক্ষ করেই খানিকটা লিখতে এবং পড়তে হবে। তবে, এইভাবে পড়ার শুধু সূত্রপাত হবে, পড়া এতে বেশি দূর এগোবে না।

দিনকতক পরে ছেলের বয়স যেমন যেমন বাড়তে থাকবে, অমনি পড়ার পরিমাণও একটু একটু করে বাড়বে। ছেলের কোন বিষয়ে কিছু জানার প্রয়োজন হলে শিক্ষক আর শুধু মুখে বলে দিয়েই খালাস হবেন না। মুখে যেটুকু বলার বলবেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যে বইয়ে যেখানে এ সম্বন্ধে আলোচনা আছে সেই বইয়ের সেইখানটা এই প্রসঙ্গে পড়তে দেবেন। এই ভাবে ছেলের বই পড়া বলতে গেলে আরম্ভ হবে। কিন্তু এই যে পড়া, এর পরিমাণ অনেকটা সীমাবদ্ধ। এ পড়া যেন খানিকটা অভিধান পড়ার মত। আমরা অভিধানের জন্যই অভিধান পড়ি না। কোন বই পড়তে পড়তে কোন একটা কথার অর্থ জানার প্রয়োজন হলে তখন আমরা অভিধান পড়ি। আর তাও যতটুকু তখন আমাদের প্রয়োজন ততটুকুই পড়ি, তার চেয়ে বেশি নয়। এই পড়াও তাই। আমাদের প্রাকৃতিক বা সামাজিক পরিবেশের কোন একটা ঘটনার অথবা কোন কাজের কোন প্রক্রিয়ার সম্বন্ধে কিছু

জানার প্রয়োজন। সেইটা জানবার জন্য আমরা বইয়ের সাহায্য নিলাম। সমস্ত বইটাই যে পড়লাম তা নয়। আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয়টি জানবার জন্য যেটুকু প্রয়োজন সেইটুকুই পড়লাম।

কেবল এই রকমের পড়ার ভিতর দিয়ে বেশি পড়া সম্ভব হয় না, এবং সেইজন্য এতে পড়ার অভ্যাসও ঠিক হয় না। তা ছাড়া এই ভাবের পড়াতে অনেক সময়ে একটা বড় জিনিসই বাদ থেকে যায়—সেটা সাহিত্য। মানুষের হৃদয়মনের প্রসারের জন্য সৎসাহিত্য পাঠের প্রয়োজন আছে। সেইজন্য তারও একটা ব্যবস্থা করতে হয়।

মানুষের জীবনে উৎসবের প্রয়োজন আছে। তাই নানা উপলক্ষে সে নানারকম উৎসবের সৃষ্টি করেছে। এই উৎসবের প্রয়োজন বাহিরের সমাজ-জীবনে যেমন, বিদ্যালয়ের সমাজ-জীবনেও তেমনই। সেইজন্য বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে বিভিন্নপ্রকার উৎসবের ব্যবস্থা করা হয়। এই উৎসবগুলিকে ভাল করে এবং সুন্দর করে পালন করতে গেলে গান গল্প আবৃত্তি অভিনয় প্রভৃতি অনেক কিছুর প্রয়োজন হবে। তার জন্য ছেলেকে এইসব জিনিস পড়াতে হবে এবং তার মধ্যে খাঁটি সাহিত্যের পর্যায়ের অনেক জিনিসও থাকবে।

কিন্তু এই পড়াও খানিকটা বাঁধাধরা পড়া। পড়ার কৌশল ভাল করে আয়ত্ত করবার পক্ষে এও ঠিক পর্যাপ্ত নয়। এইজন্য আরও কিছু পড়তে দেওয়া প্রয়োজন। সেটা কিভাবে দেওয়া যাবে?

ছেলেদের গল্প কবিতা প্রভৃতি শোনার এবং পড়ার একটা স্বাভাবিক আগ্রহ আছে। যতদিন ছোট থাকবে ততদিন শিক্ষককেই পড়ে শোনাতে হবে। কিন্তু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে

একটু একটু করে পড়তেও দেওয়া যেতে পারবে। এইভাবে পড়ার কতকটা অভ্যাস হলে পর ছেলেকে পড়বার সুযোগ দিয়ে ছেড়ে দিলে সে আপনা-আপনিই খানিকটা খানিকটা পড়তে চেষ্টা করবে। এ পড়ার কোন সীমা নাই। এখন প্রশ্ন হল, এ পড়া তো প্রয়োজনের তাগিদে পড়া নয়। বুনিয়াদী শিক্ষার যে আদর্শ তার সঙ্গে এ পড়া খাপ খাবে কেমন করে? তার উত্তরে বলা যায়, এও এক হিসাবে প্রয়োজনের তাগিদেই পড়া। তবে, এ প্রয়োজন বাহিরের প্রয়োজন নয়, ভিতরের প্রয়োজন। জীবন তো শুধু বাহিরটা নিয়েই নয়, তার একটা ভিতরের দিকও আছে। সেটাকে অস্বীকার করা যায় না। করলে জীবনকে পরিপূর্ণরূপে দেখা হয় না।

তবে, একটা কথা এইখানে বলা দরকার। এই সকল ক্ষেত্রেই সাধারণ স্কুলের পড়ানোর থেকে বুনিয়াদী স্কুলের পড়ানোর একটা তফাত থাকবে। সাধারণ স্কুলে কতকগুলো নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক থাকে। সেই পাঠ্যপুস্তক ছেলেকে প্রথম থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত পড়ানো হয়, ছেলের জীবনের প্রয়োজনে সেটা লাগুক আর নাই লাগুক, তার সম্বন্ধে ছেলের কোন স্বাভাবিক আগ্রহ থাকুক আর নাই থাকুক। সাধারণ স্কুলে ছেলে যে বই পড়বে বুনিয়াদী স্কুলেও হয়তো তাই পড়বে। তা হলেও দুটো পড়ার মধ্যে পার্থক্য আছে। বুনিয়াদী স্কুলে ছেলে বইটা প্রথম থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত পড়বে না। ছেলের যেদিন যেটা জানা প্রয়োজন সে বই থেকে সেদিন সেইটাই পড়বে। যেটা আগে প্রয়োজন সেটা পরে থাকলেও আগেই পড়বে। তেমনই, যেটা পরে প্রয়োজন সেটা আগে থাকলেও পরে পড়বে। বইয়ের সব জিনিসই যে পড়তে হবে তাও

নয়। যেগুলোর প্রয়োজন ছেলে অনুভব করবে না সেগুলো হয়তো পড়া হবেই না।

শুদ্ধ সাহিত্য হিসাবে যা পড়ানো হবে তার বিষয়েও একটা পার্থক্য থাকবে। সাধারণ বিদ্যালয়ে পড়বার তাগিদটা আসে শিক্ষকের কাছ থেকে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ছেলে নিজের তাগিদে পড়বে। তার পড়াটা হবে সম্পূর্ণ স্বাধীন পড়া। শিক্ষক ছেলের পড়ার আগ্রহ জাগিয়ে দিতে পারেন। ছেলের আগ্রহকে অবলম্বন করে হয়তো পুস্তক নির্বাচন করেও দেবেন, কিংবা ছেলে যেখানে ঠিক বুঝতে পারছে না সেখানে তাকে সাহায্যও করবেন। তবু পড়ার প্রেরণাটা প্রথমত ছেলের কাছ থেকেই আসবে। প্রচলিত শিক্ষার সঙ্গে বুনিয়াদী শিক্ষার আর একটা পার্থক্য এই যে, প্রচলিত শিক্ষা শিক্ষককেন্দ্রিক, বুনিয়াদী শিক্ষা শিশুকেন্দ্রিক।

—পাঁচ—

বুনিয়াদী শিক্ষা ও সমবায়

এ সম্বন্ধে কিছু বলবার পূর্বে 'সমবায়' কথাটির সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা দরকার। ইংরেজী কথাটি 'correlation'। দেশীয় ভাষায় তার একাধিক অনুবাদ করা হয়েছে। তার মধ্যে বেশি প্রচলিত হচ্ছে 'সমবায়'। বিনোবাজী এই কথাটির পক্ষপাতী। তিনি বলেন, সমবায় একটা নিত্য সম্বন্ধ। ঘটের মৃত্তিকা এবং ঘটের আকৃতি এই দুই নিয়ে ঘট। মৃত্তিকা এবং আকৃতি দুটো অবিচ্ছেদ্য জিনিস, একটা থেকে আর একটাকে পৃথক করা যায় না। ঘটে মৃত্তিকা এবং আকৃতির এই যে সম্বন্ধ, এর নাম সমবায়। এই রকমের সম্বন্ধ শিক্ষার ক্ষেত্রে কাজ (activity) এবং পাঠনা (instruction)-এর ভিতর। যেমন মৃত্তিকা ও আকৃতি দুই নিয়ে ঘট, শুধু মৃত্তিকাও ঘট নয়, আবার শুধু আকৃতিও ঘট নয়, তেমনই কাজ ও পাঠনা দুই নিয়ে শিক্ষা, শুধু কাজও শিক্ষা নয়, আবার শুধু পাঠনাও শিক্ষা নয়। সুতরাং কাজ এবং পাঠনার সম্বন্ধকে সমবায় বলাই উচিত। আমি এই 'সমবায়' কথাটিই ব্যবহার করছি।

এখন প্রশ্ন হল, বুনিয়াদী শিক্ষায় সমবায়ের স্থান কি হবে। এই শিক্ষায় কাজ এবং পরিবেশকে কেন্দ্র করে শিক্ষা দেওয়া হয়। যা কিছু পাঠনা তা কাজ এবং পরিবেশের সঙ্গে সম্বন্ধিত হবে, এই হচ্ছে নিয়ম। এখন এই সম্বন্ধ কি রকমের হবে?

ছেলেকে অনেক কিছুই শেখাবার আছে। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে, আর কিছু না হক, মাতৃভাষা গণিত ইতিহাস ভূগোল পৌরবিদ্যা এবং সাধারণ বিজ্ঞান, এই কয়টা তো শেখাতেই হবে। কাজ এবং পরিবেশকে অবলম্বন করে এর সবগুলো শেখানো যাবে কি না এবং গেলে কতখানি যাবে?

বুনিয়াদী শিক্ষার অনুরাগী শিক্ষাবিদ্‌রা কেউ কেউ যা বলেন তা থেকে মনে হয়, পরিবেশ তো দূরের কথা, একমাত্র কাজকে অবলম্বন করেই সব কিছু শেখানো যায়। কেবলমাত্র টাকুকে অবলম্বন করেই সমস্ত জ্যামিতি শেখানো যায়, এমন কথাও বলতে শোনা গেছে। তা হয়তো যায়। টাকুকে অবলম্বন করে জ্যামিতি কেন, শেখাব মনে করলে যে কোন একটা কিছুকে অবলম্বন করে দুনিয়ার সব কিছুই শেখানো যায়। কিন্তু এইভাবে শেখানো কি ঠিক ?

বিদ্যাসাগরকে অবলম্বন করে কয়লার প্রবন্ধ লেখার গল্প শুনেছিলাম। একজন পরীক্ষায় আসবে আশা করে কয়লার প্রবন্ধ মুখস্থ করে এসেছে। এসে দেখে, প্রবন্ধ এসেছে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে। সে আর কি করে! বিদ্যাসাগরকে অবলম্বন করে কয়লার প্রবন্ধই লিখে দিয়ে এল। 'বিদ্যাসাগর মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি একবার বর্ধমানে এসেছিলেন। এই বর্ধমানেরই একটা প্রসিদ্ধ স্থান হল রাণীগঞ্জ। রাণীগঞ্জে এমন একটা জিনিস হয় যা বাঙলা দেশে আর কোথাও হয় না। সে হচ্ছে কয়লা', এই না লিখে তার পর কয়লার সম্বন্ধে যত কিছু মুখস্থ করা ছিল সব একদিক থেকে লিখে দিল।

একটা কাজকে অবলম্বন করে সব কিছু শেখাবার কথা শুনলে আমার এই গল্প মনে পড়ে। এইভাবে শেখাবার সার্থকতা কি ? কাজটাকে বাদ দিয়ে এমনিই যদি শেখানো হত, তো ক্ষতি কি হত ?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে কাজকে অবলম্বন করে শিক্ষা কেন দিতে চাই সেই কথা ভাবতে হয়। শিক্ষা তখনই ভাল হয় যখন তার পিছনে একটা উদ্দেশ্য থাকে। শিক্ষা দেবার সময় আমরা

সাধারণত ছেলের দিক থেকে জিনিসটা দেখি না। আমরা মনে করি, ছেলের এই এই জিনিস শেখা প্রয়োজন। সেই সেই জিনিসই তাকে শেখাবার ব্যবস্থা করি। ছেলে নিজে এই জিনিসগুলি শেখার প্রয়োজন অনুভব করছে কি না তা ভেবে দেখি না। তার ফল এই হয় যে, সমস্ত শিক্ষাটাই যেন বাহির থেকে ছেলের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। এতে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে পড়ে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য হল ছেলের বিকাশ সাধন। এই বিকাশ তখনই সম্ভব হয় যখন ছেলে ভিতর থেকে শিক্ষাকে গ্রহণ করতে পারে। আমি যদি বাহির থেকে খানিকটা মাংস এনে ছেলের গায়ে চাপিয়ে দিই তা হলে তাতে ছেলের শরীরের বিকাশ হবে না। শরীরের বিকাশ সাধন করতে হলে ছেলেকে এই মাংস ভিতর থেকে গ্রহণ করতে হবে। ছেলে মাংস খাবে এবং খেয়ে হজম করবে। মাংস তার দেহের অঙ্গীভূত হয়ে যাবে। তবে মাংসের দ্বারা শরীরের বিকাশ হবে। শিক্ষার সম্বন্ধেও তাই। শিক্ষা ছেলে ভিতর থেকে নিজের ইচ্ছায় গ্রহণ করবে এবং তাকে আত্মসাৎ করে নিজের মনের অঙ্গীভূত করে নেবে। তবেই শিক্ষার দ্বারা ছেলের মনের বিকাশ হবে। বিকাশের জন্য শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ প্রয়োজন।

তা ছাড়া এই বাহির থেকে চাপানো শিক্ষায় ছেলে আনন্দ পায় না। নিরানন্দকর কাজ করতে গিয়ে তার মনের উপর অত্যধিক চাপ পড়ে। তাতে তার ক্ষতি হয়। শুধু তাই নয়। যে শিক্ষা ছেলে স্বেচ্ছায় নিজের আনন্দে গ্রহণ করছে না, তা আয়ত্ত করতে তার দেরি হয়। মনে রাখাও কষ্টকর হয়ে ওঠে। এ তো আমরা সকলেই দেখেছি যে, যে জিনিসটা আমাদের ভাল লাগে সেটা আয়ত্ত করতে আমাদের পরিশ্রম হয় না। আমরা সহজেই সেটা আয়ত্ত করতে পারি এবং সেটা আমাদের মনেও থাকে ভাল।

এই সমস্ত কারণে শিক্ষাটা এমন হওয়া দরকার যেন ছেলে নিজের ইচ্ছায় আনন্দের সঙ্গে সেটা গ্রহণ করে, বাহির থেকে জোর করে তার উপর চাপিয়ে দিতে না হয়। এটা সম্ভব হয় যখন শিক্ষার পিছনে একটা উদ্দেশ্য থাকে। ছেলে একটা উদ্দেশ্যের বশবর্তী হয়ে যখন কোন একটা তথ্য জানতে চায় বা কোন একটা কৌশল আয়ত্ত করতে চায় তখন নিজের ভিতরের প্রেরণাতেই তা করে এবং তার মধ্যে তার আনন্দও থাকে।

কাজের ভিতর দিয়ে শিক্ষা দেবার এইখানেই একটা বড় সার্থকতা। ছোট ছেলে স্বভাবতই কর্মপ্রবণ। সে সর্বদাই কিছু না কিছু করতে চায়। তাকে কাজ করতে দিলে সে খুশী থাকে। আর, এই কাজ করতে গেলেই তাকে অনেক কিছু জানতে এবং শিখতে হয়। ছেলেকে কাজ করতে দিলাম। কাজ করার তার আগ্রহ আছে। সে কাজ করতে গেল। কিন্তু গিয়ে দেখে, কাজ করতে হলে তাকে এই এই জিনিস জানতে হয় বা এই এই কৌশল আয়ত্ত করতে হয়। তখন সেই জিনিস জানার বা সেই কৌশল আয়ত্ত করার জন্যও তার আগ্রহ হয়। কাজের ভিতর দিয়ে শিক্ষা উদ্দেশ্যমূলক হয়।

এই দৃষ্টি দিয়ে দেখলে বোঝা যায়, কাজকে অবলম্বন করে ছেলেকে সেই জিনিসই শেখানো উচিত যা কাজের উপলক্ষে ছেলের শিখবার আগ্রহ হবে। কাজের জন্য যা শেখার প্রয়োজন সে অনুভব করবে, তার চেয়ে বেশি তাকে শেখাতে গেলে কাজের ভিতর দিয়ে শিক্ষা দেবার যে উদ্দেশ্য তাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। কাজকে অবলম্বন করে দুনিয়ার সব কিছু শেখাবার চেষ্টা করা এই দিক থেকে ভুল। যা শেখাতে হবে তা হবে ছেলের অনুভূত প্রয়োজনের তাগিদে, in response to a felt need of the child।

এখন প্রশ্ন, এইভাবে শেখালে স্কুলে যেসব বিষয় যতখানি শেখানো হয় তা শেখানো যাবে কি না ? শুধু কোন একরকমের কোন একটা কাজকে অবলম্বন করে যদি শিক্ষা দেওয়া যায় তা হলে যে সব বিষয় সমস্তখানি শেখানো যাবে না, এ একেবারে নিঃসন্দেহ। তবে যদি নানা রকমের নানা কাজ থাকে তা হলে খানিকটা হতে পারে। কিন্তু এর মধ্যে একটা কথা আছে। শিক্ষা তো কেবল কাজকে অবলম্বন করেই দেওয়া হবে না। ছেলের প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশকে অবলম্বন করেও শিক্ষা দেওয়া হবে। যদি কাজ এবং পরিবেশ দুটোকে অবলম্বন করে শিক্ষা দেওয়া হয় তা হলে শিক্ষণীয় বিষয়ের বেশি কিছু বাদ পড়বে না। প্রাকৃতিক পরিবেশকে অবলম্বন করে বিজ্ঞানের বিবিধ বিষয়, যেমন জ্যোতির্বিদ্যা উদ্ভিদ্‌বিদ্যা প্রাণিবিদ্যা শরীরবিদ্যা, সহজেই শেখানো যাবে। তেমনই সামাজিক পরিবেশকে অবলম্বন করে ইতিহাস ভূগোল ও পৌরবিদ্যা অনেকখানিই শেখানো যেতে পারবে।

এ ছাড়া আরও একটা জিনিস আছে। সেটা হচ্ছে ছেলের মানসিক জীবন। পরিবেশ বা কাজ সবই বাহিরের জিনিস। শুধু বাহিরটাকে নিয়েই তো মানুষ মানুষ নয়। তার ভিতরটাও আছে। সেটাকে অস্বীকার করা চলে না। ছেলে শুধু জানার জন্যই অনেক জিনিস জানতে চায়। বাহিরের কোন প্রয়োজন থাকুক আর না থাকুক, শুধু জানবার জন্যই সে অতীতের কথা এবং দেশ-বিদেশের কথা জানতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। তার এই ইচ্ছা পূর্ণ করার প্রয়োজন আছে। এই ইচ্ছা পূর্ণ করতে গেলে তাকে অনেক জিনিসই শেখাতে হবে। এই শিক্ষা কাজের জন্য না হলেও প্রয়োজনের তাগিদেই হবে। সেইজন্য মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে ছেলের পক্ষে ক্ষতিকর হবে না। বরং ছেলের একটা

প্রয়োজন মেটাবার সহায়তা করবে বলে এটা তার একটা তৃপ্তিরই কারণ হবে এবং সেই হিসাবে তার বিকাশের সাহায্য করবে।

তবে, এই সবরকম শিক্ষাই দেওয়া হবে ছেলের প্রয়োজনবোধের উপর নির্ভর করে। অনেক বিষয়েই ছেলের প্রয়োজনবোধ থাকবে না। শিক্ষককে চেষ্টা করে সেখানে প্রয়োজনবোধ জাগিয়ে তুলতে হবে। তা হলেও এ কথা ঠিক যে, যে বিষয়ে ছেলের প্রয়োজনবোধ নাই, সে বিষয়ে শিক্ষা তাকে দেওয়া হবে না। এখন এইভাবে ছেলের প্রয়োজনবোধের উপর নির্ভর করে শিক্ষা দিতে গেলে বর্তমান বিদ্যালয়ে যা শেখানো হয়, তা সব শেখানো যাবে না, এ কথা সত্য।

কিন্তু তাতে ক্ষতি কি? বর্তমান বিদ্যালয়ে অনেক অনাবশ্যক জিনিস শেখানো হয়ে থাকে। সেগুলো বাদ দেওয়াই তো ভাল। দৃষ্টান্তস্বরূপ পাটীগণিতের সিঁড়ি-ভাঙা ভগ্নাংশের কথা বলা যেতে পারে। এই ভগ্নাংশ যদি ছেলেকে না করানো যায় তো ক্ষতি কি? অবশ্য এর মধ্যে কোন কোন জিনিস ছেলের পরবর্তী জীবনে প্রয়োজন হবে। সেই হিসাবে সেগুলো শেখানো দরকার। কিন্তু সেগুলো এখনই শেখাবার জন্য তাড়াহুড়ো না করে পরে প্রয়োজন অনুসারে শেখানো যেতে পারে। শিক্ষার ফলে ছেলের মানসিক শক্তি যদি উপযুক্তরূপে বিকাশ লাভ করে তা হলে পরে এসব সে অনায়াসেই শিখে নেবে। আমরা আজকাল ছেলেকে স্কুলে যা শেখাই তা সবই অবশ্য-শিক্ষণীয় এইটা ধরে নিয়েছি বলেই বিপদ হয়েছে। তা যে নয় এইটাই আমাদের বোঝা প্রয়োজন।

—ছয়—

বুনিয়াদী শিক্ষা ও অনুশীলন

কোন একটা তথ্যকে কাজে লাগাতে হলে সেটা যেন মনে থাকে এমন করে তাকে আয়ত্ত করতে হয়। সেটা একবার শুনলে বা পড়লেই চলে না। বারবার শুনতে বা বারবার পড়তে হয়। তথ্য সম্বন্ধে যেমন, কৌশল সম্বন্ধেও তেমনই। কাজে লাগাবার মত করে কোন একটা কৌশল আয়ত্ত করতে হলে সেটা বারবার অভ্যাস করতে হয়, একবার করে ছেড়ে দিলে চলে না। নামতা মুখস্থ করতে হলে একাধিকবার আবৃত্তি করতে হয়। বই পড়ার কৌশল আয়ত্ত করতে হলেও রীতিমত অভ্যাসের দরকার। সেইজন্য সাধারণ শিক্ষা-পদ্ধতিতে practice lesson বা অভ্যাসাত্মক পাঠের ব্যবস্থা আছে। বারবার আবৃত্তি বা অভ্যাসের দ্বারা সেখানে ছেলেকে প্রয়োজনীয় তথ্য বা কৌশল আয়ত্ত করানো হয়। সাধারণত সেই তথ্য বা কৌশল দরকারে লাগবার পূর্বেই এইভাবে অনুশীলন করানো হয়ে থাকে। বুনিয়াদী শিক্ষায় এই অনুশীলনের স্থান কি হবে, এই হল প্রশ্ন।

ছেলেকে তার অনুভূত প্রয়োজনের তাগিদে শিক্ষা দেওয়াই হচ্ছে ঠিক মনস্তত্ত্বসম্মত শিক্ষা। সাধারণত শিক্ষক যে যে জিনিস ছেলের পক্ষে শিক্ষণীয় বলে মনে করেন, তাই তাকে শেখাবার ব্যবস্থা করেন। ছেলে সেটা শিখতে চায় কি না তা দেখেন না। কোন্‌টা ছেলে শিখবে আর কোন্‌টা শিখবে না, তা স্থির করবার মাপকাঠি হল শিক্ষকের প্রয়োজনবোধ, ছেলের প্রয়োজনবোধ নয়। এটা মনস্তত্ত্বসম্মত নয়।

শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে ছেলের মনের বিকাশ। শরীরের বিকাশ যে পদ্ধতিতে হয়, মনের বিকাশও সেই পদ্ধতিতেই হয়ে থাকে।

বাইরে থেকে ছেলের গায়ে খানিকটা মাংস চাপিয়ে দিলে তার শরীরের বিকাশ হয় না। তাকে খাবার খেয়ে সেটা হজম করে মাংসে পরিণত করে নিতে হয়, তবে শরীরের বিকাশ হয়। এর জন্য প্রথমেই দরকার ছেলের খাবার প্রয়োজনবোধ। ছেলের খাবার প্রয়োজনবোধ অর্থাৎ তার ক্ষুধা থাকা চাই। তা হলেই ছেলে যা খাবে তা হজম হবে এবং মাংসে পরিণত হয়ে তার শরীরের অঙ্গীভূত হবে। বিনা প্রয়োজনবোধে অর্থাৎ অক্ষুধায় খেলে সে খাবার হজম হবে না এবং তাতে শরীরের উপকার না হয়ে বরং অপকারই হবে। শরীরের বেলায় যেমন, মনের বেলাতেও তেমনই। কোন জ্ঞানের দ্বারা ছেলের মনের বিকাশ সাধন করতে হলে সে জ্ঞান আমার ইচ্ছামত ছেলের উপর চাপিয়ে দিলে চলবে না। সেই জ্ঞানের জন্য ছেলের আকাঙ্ক্ষা থাকা চাই। তবেই সে জ্ঞান ছেলের মনের অঙ্গীভূত হবে এবং তার মনের বিকাশ সাধন করবে। সেইজন্য শিক্ষা দিতে হলে ছেলের প্রয়োজনবোধকে অবলম্বন করে শিক্ষা দেওয়াই উচিত। বুনিয়াদী-শিক্ষা-পদ্ধতিতে তাই করা হয়।

বুনিয়াদী স্কুল কাজের স্কুল। সেখানে ছেলে যা শিখবে কাজের প্রয়োজনে শিখবে। সে কাজ করবে এবং কাজ করতে গিয়ে কোন একটা তথ্য বা কোন একটা কৌশল জানবার প্রয়োজন অনুভব করবে। তখন তার সেই প্রয়োজনকে অবলম্বন করে শিক্ষক তাকে শিক্ষা দেবেন। ভবিষ্যতে তার প্রয়োজন হবে, এই মনে করে শিক্ষক তাকে কিছু শেখাবেন না। বর্তমানে তার কি প্রয়োজন সেইটাই তিনি দেখবেন। এইভাবে শিক্ষা দিতে গেলে আগে থেকেই ছেলেকে কোন তথ্য বা কৌশল আয়ত্ত করানো চলে না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ নামতার কথা ধরা যাক। মনে করা যাক, ছেলেকে পাঁচের ঘর নামতা শেখাতে হবে। সাধারণত যা করা হয় তা এই। আমরা জানি, পাঁচের ঘর নামতা জানার জীবনে প্রয়োজন আছে। ছেলে সে প্রয়োজন বোঝে না। কিন্তু না বুঝলেও প্রয়োজন আছেই। তাই আমরা তাকে পাঁচের ঘর নামতা মুখস্থ করতে দিই। ছেলে বার বার আবৃত্তি করে সে নামতা মুখস্থ করে। তখন এই নামতা তার কোন কাজেই লাগে না। কবে কোন্ কাজে লাগবে তাও সে জানে না। তবু সে মুখস্থ করে।

বুনিয়াদী বিত্থালয়ে আমরা এটা করব না। পাঁচের ঘর কেন, কোন নামতার কথাই আমরা ভাবব না। আমরা ছেলেকে কাজ করতে দেব। কাজের ক্ষেত্রে যখন নামতার প্রয়োজন হবে তখন নামতা শেখাবার কথা চিন্তা করব। ছেলের ঘড়ি দেখতে শেখার প্রয়োজন হয়েছে। তাকে ঘড়ি দেখতে শেখানো হচ্ছে। কটা বেজে ক মিনিট হয়েছে দেখতে হবে। এক-একটা ঘরে পাঁচটা করে মিনিট। মিনিটের কাঁটা তুইয়ের ঘরে আছে। তুই পাঁচে কত হয় হিসাব করার প্রয়োজন হল। ছেলেকে তুটো পাঁচ যোগ করে দেখিয়ে দেওয়া হল, 'দশ'। মিনিটের কাঁটা তিনের ঘরে আছে। তিন পাঁচে কত হয় হিসাব করার প্রয়োজন হল। আবার তিনটে পাঁচ যোগ করে দেখিয়ে দেওয়া হল, 'পনের'। এইরকম কয়েকদিন হবার পর ছেলে বুঝতে পারল যে, এক পাঁচে কত হয়, তুই পাঁচে কত হয়, তিন পাঁচে কত হয়, তা জানাবার প্রয়োজন আছে। তখন তাকে পাঁচের ঘর নামতা শেখানো আরম্ভ করলাম।

তথ্য আয়ত্ত করবার সময় যেমন, কৌশল আয়ত্ত করবার সময়েও

তেমনই। ছেলেদের ভবিষ্যৎ জীবনে পড়বার প্রয়োজন হবে। সেইজন্য এখনই তাকে পড়তে শেখাতে হবে। পড়তে শিখতে হলে বর্ণপরিচয় করা দরকার। সুতরাং প্রথমেই তাকে বর্ণপরিচয় করাতে হবে, ছেলে এর প্রয়োজন বুঝুক আর নাই বুঝুক, এর জন্য তার আগ্রহ থাকুক আর নাই থাকুক। এটা ঠিক নয়। ছেলেকে পড়তে শেখাবার জন্য ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নাই। কাজের ক্ষেত্রে এমন সময় আপনা-আপনি আসবে যখন পড়ার প্রয়োজন সে অনুভব করবে। তা যদি একান্ত নাই হয়, অথচ ছেলেকে পড়তে আমরা শেখাতে চাই, তা হলে এমন অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে যাতে পড়ার প্রয়োজন সে অনুভব করতে পারে। পড়ার প্রয়োজন বোধ করলে স্বাভাবিকভাবেই পড়ার জন্য তার আগ্রহ হবে। তখন সেই আগ্রহকে অবলম্বন করে তাকে পড়তে শেখাতে হবে। প্রথম প্রথম তার প্রয়োজন অনুসারে তাকে একটা গোটা শব্দ বা গোটা বাক্যই পড়তে দেওয়া হবে। এইভাবে পড়তে পড়তে সে দেখতে পাবে, বিভিন্ন শব্দ নিয়ে বাক্য এবং বিভিন্ন বর্ণ নিয়ে শব্দগুলি তৈয়ারি। তখন বর্ণপরিচয় করার জন্যও তার আগ্রহ হবে। সেই সময় যখন যেমন প্রয়োজন তখন সেই-রকমভাবে তাকে বর্ণপরিচয় করাতে হবে। তখনও একেবারে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত বর্ণ শেখাবার প্রয়োজনই নাই। প্রথমে এলোমেলোভাবেই শেখা হবে। তার পর মোটামুটি সমস্ত বর্ণগুলি শেখা হলে, কোন্‌টি সংযুক্ত বর্ণ আর কোন্‌টি অসংযুক্ত বর্ণ, কোন্‌টি স্বর আর কোন্‌টি ব্যঞ্জন, তা বুঝিয়ে দিলেই চলবে।

সংখ্যাই কি আর বর্ণই কি, আমরা শ্রেণীবিন্যস্তভাবে শেখাতে অভ্যস্ত। এলোমেলোভাবে, যখন যেমন প্রয়োজন তখন সেইরকম, শেখাবার কথায় আমরা ভয় পেয়ে যাই। কিন্তু একটু ভেবে দেখলে

দেখা যাবে, এই যে শ্রেণীবিন্যাস এ তো আমাদের পরিণত মনের পরবর্তী সৃষ্টি। আমাদের অভিজ্ঞতা কিন্তু এমনভাবে হয় না। আমরা প্রথমে শুধু বিশেষ্য, তার পরে শুধু বিশেষণ এবং তার পরে শুধু ক্রিয়া, এভাবে শব্দ বলতে শিখি না। এলোমেলোভাবে যখন যেমন প্রয়োজন তখন তেমনই শব্দ আমরা শিখি। তার মধ্যে কিছু বিশেষ্য, কিছু বিশেষণ, কিছু বা ক্রিয়া থাকে। পরে শ্রেণীবিন্যাসের সার্থকতা বুঝলে তখন তাদের শ্রেণীবিন্যাস করে বিশেষ্য বিশেষণ ক্রিয়া এইভাবে সাজিয়ে নিই। কথা বলার ক্ষেত্রে যেমন, পড়ার ক্ষেত্রেও তেমনই হতে কোন বাধা নাই। বরং এরকমটা না হলেই সেটা অস্বাভাবিক হবে।

এইখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে। কোন ছেলেকে কোন একটা জিনিস শেখার প্রয়োজন যদি বোঝাতে না পারা যায় তা হলে কি হবে? তা হলে কি তাকে সেটা অভ্যাস করানো হবে না? তার উত্তর এই যে, যতদিন তা না বোঝানো যায় ততদিন সেটা বন্ধ রাখতে হবে। ছেলে যখন আরও বড় হবে এবং এইটা শেখার প্রয়োজন অনুভব করতে পারবে, তখনই সেটা অভ্যাস করানো হবে। যদি কোনদিনই তাকে এর প্রয়োজন বোঝাতে না পারা যায় তা হলে বুঝতে হবে, সে জিনিসটা অনাবশ্যক, সেটা শেখাবারই দরকার নাই।

কিন্তু এ তো গেল পূর্ব-অনুশীলনের কথা। এর পরেও আর একটা প্রশ্ন থেকে যায়। ছেলে কোন একটা জিনিস শেখার প্রয়োজন অনুভব করল, সেটা শেখার জন্য আগ্রহও তার হল। তখন কি করা হবে? তখন তাকে বারবার আবৃত্তি বা বারবার অভ্যাস করে কোন একটা তথ্য বা কোন একটা কৌশল আয়ত্ত করতে দেব কি না?

ছেলে যদি নিজের আগ্রহে আনন্দের সঙ্গে কোন কাজ বারবার করে তা হলে তাতে আপত্তি করবার কিছুই নাই। কিন্তু এক কাজ বারবার করাটা অস্বাভাবিক। সাধারণত ছেলে তা করতে চায় না। একই কাজ একাধিকবার করতে গেলে খানিকটা জোর করেই করাতে হয়। তাতে ছেলের মনের উপর চাপ পড়ে, তার ক্ষতি হয়। সেইজন্য এক কাজ একই সময়ে ছেলেকে দিয়ে বার-বার না করানোই ভাল। এই অনেকের মত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন ওঠে, তা হলে কোন তথ্য মুখস্থ কেমন করে হবে বা কোন কৌশল অভ্যাস কেমন করে হবে? তার উত্তরে তাঁরা বলেন, অনেক তথ্য আপনা-আপনিই বারবার ছেলের সামনে উপস্থিত হয় এবং অনেক কৌশলও ছেলেকে কাজের প্রয়োজনে বারবার ব্যবহার করতে হয়। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই তথ্য তার মুখস্থ হয়ে যায়, কৌশলও সে অভ্যাস করে ফেলে। এতে হয়তো একটু দেরি হতে পারে, কিন্তু তাতে কোন ক্ষতি হয় না। বরং স্বাভাবিকভাবে হয় বলে কাজ আরও ভাল হয়। যেখানে একটি মাত্র কাজ থাকে সেখানে একই তথ্য বা একই কৌশল আপনা-আপনি বারবার ছেলের সামনে হয়তো না আসতে পারে, কিন্তু একাধিক কাজ থাকলে এ অসুবিধা হয় না। বস্তুত ছেলের জীবনে কাজ তো অনেকরকমই আছে। একই তথ্য বা একই কৌশল তাতে অনেক সময়েই ব্যবহার করতে হয়। শিক্ষক এইসব কাজের সুবিধা নিয়ে ছেলেকে এই তথ্য বা কৌশল অভ্যাস করাতে পারবেন। যেখানে তাও সম্ভব না হবে সেখানে কৌশলী শিক্ষক এই উদ্দেশ্য নিয়ে নূতন কাজ সৃষ্টি করবেন, এমন কাজ যার ভিতর দিয়ে সেই তথ্য বা কৌশল অভ্যাস করবার সুযোগ পাওয়া যায়।

আবার পাঁচের ঘর নামতার কথাটা ধরা যাক। বারবার আবৃত্তি করে ছেলেকে পাঁচের ঘর নামতা মুখস্থ কোনদিনই করানো হবে না। নামতা শেখার প্রয়োজন অনুভব করবার আগে তো নয়ই, পরেও নয়। দিনের পর দিন কাজের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে করতেই ছেলের আপনা-আপনি পাঁচের ঘর নামতা মুখস্থ হয়ে যাবে। প্রথমত, ঘড়ি ছেলেকে রোজই দেখতে হবে। সময় হিসাব করে কাজ করতে হলে দিনের মধ্যে একাধিকবারই দেখবার প্রয়োজন হবে। প্রত্যেকবারই মিনিটের হিসাব করবার সময় ছেলেকে পাঁচের ঘর নামতার ব্যবহার করতে হবে। শুধু মিনিটের হিসাব করবার সময়েই পাঁচের ঘর নামতার প্রয়োজন হবে তা নয়। ছেলেরা সুতা কাটার সময় তোলা হিসাবে তুলা ওজন করে নেবে। শ্রেণীতে মোট কত তুলা নেওয়া হল তার হিসাব করবার সময় ছটাক হিসাবে তার পরিমাণ কত ছটাক হল তাও হিসাব করতে হবে। তখনই আবার পাঁচের ঘর নামতার প্রয়োজন হবে। এ ছাড়াও শিক্ষক কৌশল করে পাঁচের ঘর নামতা ব্যবহার করতে হয় এমন অবস্থার সৃষ্টি করতে পারেন। ধরা যাক, ছেলেদের এক এক সারে পাঁচজন করে বসতে দেওয়া হল। সঙ্গে সঙ্গেই পাঁচের ঘর নামতা ব্যবহার করবার অনেক সুযোগ পাওয়া গেল। আসন বা অন্য জিনিস এক সারে পাঁচটা করে দরকার হলে দু সারে কটা লাগবে, তিন সারে কটা লাগবে, হিসাব করতে গেলেই পাঁচের ঘর নামতার প্রয়োজন হবে। যাতে পাঁচের ঘর নামতা ব্যবহার করতে হয় এমন খেলাও অনেক দেওয়া যেতে পারে।

এইভাবে কাজ করার কিন্তু একটু অসুবিধা আছে। যে তথ্য বা যে কৌশল আয়ত্ত করতে হবে, অনেক সময়েই সেটা উপর্যুপরি

কয়েকবার অভ্যাস করতে হয়। প্রথম অভ্যাসের রেশটা বজায় থাকতে থাকতে দ্বিতীয়বার অভ্যাস করতে পারলে অভ্যাসটা সহজে বদ্ধমূল হয়। অভ্যাসের ক্ষেত্রটা স্বাভাবিক হলে ভাল হয়, এ কথা ঠিক। কিন্তু এত ঘন ঘন অভ্যাসের স্বাভাবিক ক্ষেত্র পাওয়া বড় কঠিন। এক অভ্যাস এবং আর এক অভ্যাসের মধ্যে খানিকটা ব্যবধান থেকেই যাবে। অভ্যাসের জন্য নানারকম কাজের সৃষ্টি অবশ্যই করা যেতে পারে। কিন্তু অনাবশ্যক কাজের বাহুল্যে ছেলের বিভ্রান্ত হবারও খানিকটা সম্ভাবনা আছে। এই রকমের সৃষ্টি-করা খেলার মধ্যেও প্রকৃত খেলার স্বাচ্ছন্দ্য ও মাধুর্য থাকে না। এক এক সারে পাঁচটি করে ছেলে বসিয়ে পাঁচের ঘর নামতা ব্যবহারের ক্ষেত্র রচনা খুব স্বাভাবিক নয়। এখানে স্বাভাবিকতার আবরণ দিয়ে অস্বাভাবিকতাকে ঢাকবার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু সে আবরণ এমনই পাতলা যে ভিতরকার অস্বাভাবিকতা সহজেই ধরা পড়ে যায়।

তা ছাড়া, যে তথ্য বা যে কৌশলের প্রয়োজন ছেলে বোঝে না তার কথা আলাদা। কিন্তু যার প্রয়োজন ছেলে বুঝেছে সেটা একাধিকবার অভ্যাস করতে সে আপত্তি করে না। একটা কাজ বারবার করার মধ্যেও এক রকমের আনন্দ আছে। ছেলেরা সেটা চায়। অভ্যাসটা বিরক্তিকর হয়ে উঠলে কাজের এবং ছেলের দুইয়ের পক্ষেই সেটা ক্ষতিকর হবে, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। কাজেই ছেলেকে একাধিকবার কোন কিছু করাবার সময় এদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ছেলেকে ততক্ষণই অভ্যাস করতে দেওয়া উচিত যতক্ষণ সে আনন্দের সঙ্গে করবে। একটা কিছু বড্ড বেশিক্ষণ অভ্যাস করতে দেওয়ার অন্য অসুবিধাও আছে। তাতে অনেক ক্ষেত্রেই যে-পরিমাণ সময় ব্যয় হয় সে পরিমাণে

লাভ হয় না। শুধু তাই নয়, এতে ক্ষতি হবার সম্ভাবনাও আছে। কিছুক্ষণ অভ্যাস করিয়ে তার পর খানিকটা সময় বাদ দিয়ে আবার কিছুক্ষণ অভ্যাস করানোই ভাল। ইংরেজীতে একটা কথা আছে, "We learn to skate in summer and swim in winter"। আমরা গ্রীষ্মকালে বরফের উপর চলতে আর শীতকালে সাঁতার দিতে শিখি। শীতপ্রধান দেশে শীতের সময় নদী-নালা জমে বরফ হয়ে যায়। গ্রীষ্মকালে সেই বরফ গলে আবার জল হয়। শীতের সময়েই মানুষ বরফের উপর চলে এবং গ্রীষ্মকালেই সাঁতার দেয়। কিন্তু গ্রীষ্মকালে সাঁতার দিতে আরম্ভ করলেও সাঁতার শেখা তখন হয় না। শীতকালে যখন সাঁতার দেওয়া হয় না তখনও সাঁতার দেওয়ার অভ্যাসটা ভিতরে ভিতরে কাজ করতে থাকে। তার ফলে পরের গ্রীষ্মে দেখা যায় যে, সাঁতার-শিক্ষার্থী সাঁতার শিখে গেছে। একেবারে একটানা অনেকক্ষণ অভ্যাস না করানোই যে ভাল, এ তারই প্রমাণ।

এ ছাড়াও আর একটা কথা আছে। এমন অনেক জিনিস আছে যা অভ্যাস করবার ক্ষেত্র আপনা-আপনি আসে, না এলেও অল্প একটু চেষ্টা করে রচনা করা যায়। কিন্তু এমন জিনিসও অনেক আছে যার অভ্যাসের ক্ষেত্র অত সহজে মেলে না। যেমন, সংখ্যা গোনার বা যোগ-বিয়োগের ক্ষেত্র রোজই পাওয়া যায়। লঘূকরণের ক্ষেত্র তা যায় না। এইরকম ক্ষেত্র পর্যাপ্ত পরিমাণে সৃষ্টি করতে গেলে সেটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক হয়ে যায়।

এইজন্য মনে হয়, কিছুটা অভ্যাস বা অনুশীলনের প্রয়োজন আছে। যেসব তথ্য বা কৌশল একটু তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করতে পারলে কাজের সুবিধা হয় সেগুলো অনুশীলনের দ্বারা আয়ত্ত

করাবার ব্যবস্থা করাই ভাল। একটা বয়স আছে, যে বয়সের মধ্যে নূতন অভ্যাস সহজে করা যায়। কোন কিছু মুখস্থ করলে মনেও ভাল থাকে, আবার কোন কাজ অভ্যাস করতে গেলে অভ্যাসও ভাল হয়। এই বয়সটার সুযোগ নেবার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো একটু সকাল সকাল আয়ত্ত করিয়ে দিতে পারলে সুবিধা হয়। তবে, কয়েকটা বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রয়োজন না বুঝলে অভ্যাস করতে না দেওয়াই ভাল। প্রয়োজন বোঝার পর অভ্যাস করতে দিতে হবে, এবং তাও একবারে বেশিক্ষণ দেওয়া চলবে না। যেটুকু অভ্যাস করানো হবে তা যেন ছেলে বেশ আনন্দের সঙ্গে করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং সেইভাবের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। তার পর অভ্যস্ত জিনিসটা কাজে লাগাবার মত ক্ষেত্রও তৈয়ারি করতে হবে, যেন ছেলে তার অভ্যস্ত তথ্য বা কৌশল ব্যবহার করবার সুযোগ পায়।

—সাত—

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কাজ

কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দিলে ছেলের বিকাশ ভাল হয় এবং হাতে-কলমে শেখে বলে শিক্ষাও সহজ হয়। তাই বিদ্যালয়ে কাজের প্রবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা সকলেই অনুভব করছেন। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ও কাজের বিদ্যালয়।

এখন বিদ্যালয়ে ছেলেকে কি কাজ দেওয়া হবে সেই হল প্রশ্ন। বিদ্যালয়ের লক্ষ্য ছেলেকে জীবনের জন্য প্রস্তুত করা, এবং জীবনের ভিতর দিয়েই ছেলেকে জীবনের জন্য প্রস্তুত করা যেতে পারে। সুতরাং বিদ্যালয়ের কাজ কোন একটা বিশেষ রকমের কাজ না হয়ে জীবনের সমস্ত কাজই হবে, এইটাই হওয়া উচিত।

জীবনের একটা বড় প্রয়োজন পরিচ্ছন্নতা। স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য রক্ষা করে বাঁচতে হলে এটা সকলের আগে চাই। সেইজন্য বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে সাফাইকে একটি বড় স্থান দেওয়া হয়েছে। সাফাই বলতে ব্যক্তিগত সাফাই এবং পারিবেশিক সাফাই দুইই বোঝায়। ছেলের শরীর জামা কাপড় ইত্যাদি পরিষ্কার রাখাই হল ব্যক্তিগত সাফাই। জামায় বোতাম লাগানো এবং ছেঁড়া জামা কাপড় সেলাই করাও এর মধ্যে পড়ে। যেখানে ছেলে বাস করে বা কাজ করে সেই জায়গা এবং কাজের জিনিস পরিষ্কার রাখা হল পারিবেশিক সাফাই।

বিদ্যালয়ে এসে প্রথমেই ছেলেরা বিদ্যালয় পরিষ্কার করে এবং শ্রেণী সাজায়। প্রত্যেক শনিবারে বিদ্যালয়গৃহ নিকিয়ে দেয়। বিদ্যালয় পরিষ্কার করতে যে সমস্ত সরঞ্জামের প্রয়োজন, যেমন

ঝাঁটা ও ঝুড়ি, তা ছেলেদের করে নিতে হয়। পা মোছার জন্য পাপোশ, মুখ-হাত মোছার জন্য তোয়ালে, ছেলেরাই বুনে নেয়। ছেঁড়া কাগজ ইত্যাদি ফেলবার জন্য ঝুড়িও ছেলেরাই তৈয়ারি করে।

মানুষকে বাঁচতে হলে তার অন্ন বস্ত্র গৃহ এবং গৃহোপকরণের প্রয়োজন। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের লক্ষ্য ছেলেকে স্বাবলম্বী করা। সেইজন্য বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ছেলে যাতে তার খাবার, তার কাপড় ও ব্যবহারের অন্যান্য জিনিস তৈয়ারি করে নিতে পারে তার জন্য তাকে উৎসাহিত করা হয়। ছেলেকে বাগান করতে, সুতা কাটতে ও কাপড় বুনতে এবং বিদ্যালয়ের জীবনে তার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি তৈয়ারি করে নিতে শেখানো হয়।

ছেলেরা বাগান করে। বাগান করতে গেলেই জমি কোপানো, মাটি তৈয়ারি করা, বীজ বোনা, গাছে জল দেওয়া, ফসল তোলা এবং বীজ সংরক্ষণ—এই সব কাজই তাকে করতে হয়। গরু ছাগলের হাত থেকে গাছ রক্ষা করবার জন্য জমিতে বেড়া দিতে হয়। ফলের গাছ বসিয়ে গাছের ঘেরাও ছেলেরাই তৈয়ারি করে দেয়।

ছেলেরা সুতা কাটে। সুতাকাটার কাজ করতে হলেই আনুষঙ্গিক আরও কয়েকটি কাজ এসে পড়ে। সুতাকাটা উপলক্ষে ছেলেকে তুলা পরিষ্কার করতে হয়, পিঁজতে হয়। পেঁজা তুলা ধুনে আবার পাঁজ করতে হয়। তার পরে সুতা কাটতে হয়। পেঁজা এবং ধোনা তুলা রাখবার জন্য চুপড়ি ব্যবহার করা হয়। ছেলেরা সেই চুপড়ি নিজেরাই তৈয়ারি করে নেয়। ধুনবার চিকও ছেলেরাই করে। ছোট ছেলেরা টাকুতে সুতা কাটে। টাকু ঘোরাবার জন্য পাটা বড় ছেলেরা করে দেয়।

এ ছাড়া ছেলেদের প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় বহু জিনিস ছেলেদের করতে দেওয়া হয়। বসবার জন্য আসনের প্রয়োজন। খেজুরপাতা বা তালপাতা যখন যেখানে যেটি মেলে তাই দিয়ে আসন তৈয়ারির কাজও ছেলেরা করে।

ছেলেরা খাতা পেনসিল রাখবার জন্য দড়ির থলি এবং চটের বা তালপাতার ব্যাগ তৈয়ারি করে। ছেলেদের বই খাতা ছেলেরা নিজেরাই বাঁধিয়ে নেয়। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক নাই। যখন যে বিষয়ে আলোচনা হয় ছেলেরা নিজের নিজের খাতায় লিখে নেয়। এইভাবে তাদের নিজেদের বই নিজেরাই তৈয়ারি করে।

ছেলেরা দেয়াল-পঞ্জিকা ব্যবহার করে। সেই দেয়াল-পঞ্জিকা তাদের করে নিতে শেখানো হয়। প্রত্যেক মাসের শেষ সপ্তাহে তারা পরের মাসের দেয়াল-পঞ্জিকা করে নেয়।

এ ছাড়া বিদ্যালয়-সংক্রান্ত আরও অনেক কাজ ছেলেরা করে। গ্রামে কাগজ কালি কলম প্রভৃতি শিক্ষার সরঞ্জাম সব সময় মেলে না। তাই এইসব বিক্রী করবার জন্য বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে একটি করে দোকান থাকে। দোকানে ছেলেদের কাটা সুতায় বোনা কাপড়ও বিক্রি হয়। বেচা-কেনার কাজ ছেলেরাই করে।

উৎসব বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের একটি অঙ্গ। উৎসব উপলক্ষে কাগজের ফুল মালা ইত্যাদি তৈয়ারি করে ঘর সাজানো, আলপনা দেওয়া এবং উৎসবের ব্যবস্থা করা—সব কাজ ছেলেরা নিজেরাই করে। উৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রণের চিঠি লিখে ছেলেরাই বিলি করে। চিঠির খাম নিজেরাই তৈয়ারি করে নেয়।

উৎসব উপলক্ষে তারা ছবি আঁকে, গান শেখে। জন্মদিনের উৎসব উপলক্ষে এলবাম এবং বর্ষপঞ্জী তৈয়ারি করে।

ছেলেদের নানারকম জিনিস সংগ্রহ করার একটা প্রবৃত্তি আছে। এই প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য ছেলেদের ছবি প্রভৃতি সংগ্রহ করতে দেওয়া হয়। তারা খবরের কাগজ থেকে দেশবিদেশের বিখ্যাত লোকের ছবি, নানারকম পশু-পক্ষীর ছবি এবং ফুলপাতা সংগ্রহ করে তার এলবাম তৈয়ারি করে।

ছেলেদের হাতে-লেখা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র আছে। তাতে বিদ্যালয় গ্রাম এবং দেশবিদেশের খবর থাকে। কাগজের সম্পাদক এবং সাংবাদিক ছেলেদের মধ্যে থেকেই হয়। বিদ্যালয়ে ত্রৈমাসিক কাগজ আছে। তারও সম্পাদনার কাজ ছেলেরা করে। ত্রৈমাসিক কাগজে ছেলেদের লেখা গল্প প্রভৃতি এবং ছেলেদের আঁকা ছবি থাকে।

কাজ করতে গেলেই অনেক কিছু জানতে হয়। কিছু বা শিক্ষকের কাছে শুনেও জানা যায়, আবার কিছু বা বই পড়ে জানতে হয়। সেইজন্য বিদ্যালয়ের পাঠাগারে নানা রকমের বই রাখতে হয়। তা ছাড়া, সব ছেলেরই গল্প এবং কবিতা পড়ার আগ্রহ আছে। তার জন্যও বই চাই। পাঠাগারের বই দেওয়া-নেওয়ার কাজ ছেলেরাই করে।

বিদ্যালয় পরিচালনার কাজেও ছেলেদের সাহায্য করতে হয়। ক্লাসে নাম ডেকে হাজিরা করা, কাজের হিসাব রাখা, এইসব ছেলেরাই করে। এর জন্য খাতাপত্রও ছেলেদেরই করতে হয়।

এক কথায় বলতে গেলে, বুনিয়াদী বিদ্যালয় ছেলেদের একটি ছোট সমাজ। সেখানে শিক্ষক ও ছাত্র সকলেই কাজ করে এবং সকলের সমবেত চেষ্টায় বিদ্যালয়-সমাজ পরিচালিত হয়। এজন্য

নানা রকমের কাজ করতে হয়। তাতে কাজ একঘেয়ে বোধ হয় না এবং কাজের ভিতর দিয়ে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষারও সুবিধা হয়।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের আর একটা বড় লক্ষ্য শিক্ষাকে স্বাবলম্বী করা। শিক্ষাকে স্বাবলম্বী করতে হলে ছেলেকে এমন কাজ দিতে হয় যার আয় থেকে বিদ্যালয়ের চলতি খরচ, অন্তত শিক্ষকের বেতন, উঠে আসে—এমন কাজ যার থেকে কিছু উপার্জন হয়। উপার্জনের জন্য আলাদা করে কোন কাজ করবার প্রয়োজন নাই। তারা নিজেদের প্রয়োজনে যে কাজ করে তারই কোন একটি বা দুটি একটু বেশি করে করলেই চলে। এমন কাজ বেছে নিতে হয় যা বিদ্যালয়ের স্বল্প পরিসরের মধ্যে করা সম্ভব এবং যার মাধ্যমে বেশি শেখানো যায়। কাজ আবার ছেলেদের বয়সের উপযোগী হওয়া চাই। সব দিক চিন্তা করে সুতা কাটা এবং কাপড় বোনাকেই অধিকাংশ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে এই কাজ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

—আট—

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পড়া (১)

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট কোন পাঠ্যপুস্তক নাই। কাজেই এখানে ছেলেরা সাধারণ নিয়মে পড়তে শেখে না। এখানে পড়তে শেখানোর প্রণালী স্বতন্ত্র।

ছেলে যখন প্রথম বিদ্যালয়ে আসে তখন তাকে কয়েকদিন কথা বলানোই হয় শিক্ষকের কাজ। এই কথা বলা হয় পড়ানোর প্রস্তুতি। ছোট ছেলে স্পষ্ট করে কথা বলতে পারে না। কথাও হয় অসংবদ্ধ। তাতে আবার ভাষার এবং উচ্চারণের ত্রুটি আছে। আঞ্চলিক ত্রুটিও বটে, ব্যক্তিগত ত্রুটিও বটে। ছেলের কথা স্পষ্ট হবে, উচ্চারণ শুদ্ধ হবে এবং সে তাড়াতাড়ি গুছিয়ে কথা বলতে পারবে, সেই দিকে দৃষ্টি রেখে ছেলেকে কথা বলাতে হয়।

বিদ্যালয়ে ছেলের কথা বলা আরম্ভ হয় শিক্ষক ও ছাত্রের এবং ছাত্রদের পরস্পরের পরিচয়ের মধ্য দিয়ে। ছেলে যাতে নিজের পরিচয় ঠিকভাবে দিতে পারে সেইজন্য প্রথমেই প্রত্যেক ছেলেকে তার নিজের নাম, বাবার নাম ও গাঁয়ের নাম বলতে শেখানো হয়।

বার তারিখ সম্বন্ধে কথা হয়। প্রথমে কয়েকদিন শুধু বার এবং কিছুদিন পরে বার তারিখ দুটোর সম্বন্ধেই কথা হয়। এর প্রয়োজন আছে। বিদ্যালয়ে ছুটি পড়লে কবে ছুটি এবং আবার কবে আসতে হবে তা ছেলেকে বুঝিয়ে দিতে হয়। বার তারিখ জানা থাকলে বাড়িতে জিজ্ঞাসা করে ছেলে ছুটির পরে বিদ্যালয়ে হাজির হতে পারে।

ছেলের বিদ্যালয়ের জীবন এবং বাড়ির জীবন সম্বন্ধে কথা হয়।

শ্রেণীতে কতজন ছেলের মধ্যে কতজন এসেছে এবং কতজন আসে নাই হিসাব হয়। পরের দিন আগের দিনের উপস্থিতির সঙ্গে সেই দিনের উপস্থিতি মিলিয়ে দেখা হয়।

উপস্থিত ছেলের মধ্যে কতজন স্নান করেছে, কতজন করে নাই, কতজন দাঁত মেজেছে, কতজন মাজে নাই, এইসব সম্বন্ধে কথা বলা হয়। প্রত্যেকদিন ছেলেদের দাঁত নখ চুল ইত্যাদি পরিষ্কার আছে কিনা দেখা হয়। সেই প্রসঙ্গেই এইসব কথা হয়। সঙ্গে সঙ্গে নখ দাঁত ইত্যাদি পরিষ্কার রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও কথা হয়।

ছেলেরা খেয়ে এসেছে কিনা এবং কে কি খেয়ে এসেছে, শিক্ষক এইসব বিষয়ে ছেলেদের সঙ্গে কথা বলেন। এইভাবে ছেলের বাড়ির জীবনকে অবলম্বন করে কথা হয়।

তার পর ছেলের পরিবেশকে অবলম্বন করেও কথা হয়। আবহাওয়া সম্বন্ধে কথা হয়। প্রতিদিন রোদ বৃষ্টি মেঘ বা বাতাস যেদিন যা হয়, সেইদিকে ছেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। তাই নিয়ে শিক্ষক ছেলের সঙ্গে কথা বলেন।

গ্রামের মাঠে চাষ হয়। কখন কি চাষ হল সেই সম্বন্ধে কথা হয়। গ্রামে হাট বসে। হাট সম্বন্ধে শিক্ষক ছেলের সঙ্গে কথা বলেন। এই প্রসঙ্গে হাটে কি জিনিস কোথা থেকে আসে, কোথায় যায়, সব আলোচনা করা হয়। বিদ্যালয়ে বাড়িতে বা গ্রামে কোন বিশেষ ঘটনা ঘটলে বা কোন উৎসব হলে সেই বিষয়েও ছেলের সঙ্গে কথা হয়।

কয়েকদিন গেলেই ছেলেরা কাজ করতে আরম্ভ করে। প্রথমে ঘর পরিষ্কার, শ্রেণী সাজানো প্রভৃতি কাজ করে। তার পর আস্তে আস্তে অন্যান্য কাজও করতে শেখে। কাজ করবার আগে কাজের পরিকল্পনা করা হয়। কি কাজ হবে এবং কাজের সরঞ্জাম কি কি

দরকার হবে ছেলেদের দিয়ে বলিয়ে নেওয়া হয়। কাজের পর কাজের হিসাব হয়। দিনের শেষে সারাদিন স্কুলে ছেলে কি কি কাজ করল তা নিয়েও আলোচনা হয়।

এইসব উপলক্ষে ছেলেকে গুছিয়ে স্পষ্ট করে কথা বলানোর দিকে নজর রাখা হয়। সবক্ষেত্রেই কথা বলে ছেলেরা। শিক্ষকের কাজ কেবলমাত্র প্রশ্ন করে কথা বার করে নেওয়া।

ছেলেদের গল্প বলা হয়, এবং সেই গল্প তাদের দিয়ে বলানো হয়। কখনও কখনও সেই গল্প ছেলেদের দিয়ে অভিনয়ও করানো হয়। তা ছাড়া কবিতা আবৃত্তি করানো হয়। শিক্ষক আবৃত্তি করেন, ছেলেরাও সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করে। ছেলেদের গান শেখানো হয়। গান দিয়েই বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ করা হয়। কাজের সঙ্গে সঙ্গেও মাঝে মাঝে গান হতে থাকে। উৎসব পালন এবং মাসিক সাহিত্যসভা উপলক্ষে আবৃত্তি ও গান আরও বেশি করে করানো হয়।

দিন কয়েক পরে পড়ানো আরম্ভ হয়। বলার পরিণতি হিসাবে স্বাভাবিকভাবে পড়া আপনা-আপনি আসে। সব আলোচনা সব সময় ছেলের মনে থাকে না। তখনই প্রশ্ন ওঠে পড়ার। এক বিষয়ে একদিন আলোচনা হলেও পরে প্রসঙ্গক্রমে সেই আলোচনা আবার ওঠে। তখন হয়তো দেখা গেল, অধিকাংশ ছেলের তা মনে নাই। তখনই পূর্বদিনের আলোচ্য বিষয় লিখে রাখার সুবিধার দিকে ছেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। মুখের কথা মানুষ ভুলে যেতে পারে। কিন্তু লেখা থাকলে ভুলে গেলেও পড়ে নেওয়া চলে। এইভাবে ছেলের মনে লেখাপড়ার প্রয়োজনবোধ জাগিয়ে দেওয়া হয়।

প্রয়োজনের তাগিদে পড়লে তাড়াতাড়ি পড়তে শেখে। সেই

পড়া মনেও থাকে। কাজের মাধ্যমে পড়তে শেখে বলে এক কাজের অভিজ্ঞতা অন্য কাজেও লাগাতে পারে। সাধারণ বিদ্যালয়ে ছেলে নিজের প্রয়োজনে পড়ে না। সেখানে জীবনের সঙ্গে লেখা-পড়ার যোগ নাই। ছেলে জানে, বিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশের জন্যই পড়া। বই পড়া যে তার জীবনের কাজে সহায়তা করতে পারে এটা তার মনেই আসে না। বিনা প্রয়োজনে পড়তে হয় বলে সেই পড়ায় তার আগ্রহ থাকে না। পড়া মনে রাখা এবং পঠিত বিদ্যা কাজে লাগানোও শক্ত হয়।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ছেলেরা প্রথম পড়তে শেখে নিজের নাম। কাজের সরঞ্জাম প্রত্যেক ছেলের আলাদা আলাদা। কাজেই নাম লেখা না থাকলে কোন্‌টা কার জিনিস চেনা যাবে কেমন করে? এইভাবে আলোচনা করে নাম লেখার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দেওয়া হয়। তার পর প্রত্যেকের জিনিসের গায়ে তার নাম লিখে দেওয়া হয়। কাজের সরঞ্জাম ছেলেদেরই বিলি করতে দেওয়া হয়। এইভাবে তারা নিজের নামের সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীর অন্য সকলেরও নাম পড়তে শেখে।

প্রতিদিন উপস্থিতির হিসাব করবার সময় পূর্বদিনের উপস্থিতির সঙ্গে তার তুলনা করা হয়। অনেক সময়েই দেখা যায়, পূর্বদিনের উপস্থিতির কথা ছেলেদের মনে নাই। তখনই উপস্থিতির হিসাব লিখে রাখার প্রয়োজন বুঝিয়ে দেওয়া হয়। শিক্ষক এই হিসাব লিখে রাখেন এবং কি লিখছেন তা পড়ে শুনিয়ে দেন। পরের দিন আবার হিসাব লেখা হয় এবং পূর্ব হিসাবের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়। আমাদের বিদ্যালয়ে আমরা উপস্থিতির হিসাব লেখা কার্ড ব্যবহার করি। শিক্ষক সেই কার্ডগুলি একটি ফ্রেমে সাজিয়ে দেন। একটি কার্ডে লেখা থাকে 'জন এসেছে', আর একটিতে

'জন আসে নাই'। সংখ্যাজ্ঞাপক কতকগুলি কার্ডও সঙ্গে থাকে। প্রয়োজনমত সেগুলি গোড়ায় বসিয়ে দেওয়া হয়। দিনকয়েক পরে ছেলেদেরই এই কার্ড সাজাতে দেওয়া হয়। তারা সাজায় এবং কি সাজাল তা বলে। এইভাবে তাদের খানিকটা পড়া হয়।

বিত্তালয়ের আরম্ভেই ছেলেদের দাঁত নখ ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয় এবং তারা স্নান করেছে কি না দেখা হয়। যারা দাঁত মাজে নাই, নখ কাটে নাই, তাদের দাঁত মাজিয়ে দেওয়া হয়, নখ কেটে দেওয়া হয়। যারা স্নান করে নাই, সম্ভব হলে তাদের স্নানও করিয়ে দেওয়া হয়। সেই সময় কতজন স্নান করেছে, কতজন করে নাই, কতজন দাঁত মেজেছে, কতজন মাজে নাই, তার হিসাব হয়। পরের দিন হিসাবের সময় পূর্বদিনের হিসাবের সঙ্গে তা মিলিয়ে দেখা হয়। সেইজন্য উপস্থিতির মত এইসব কথার কার্ডও ফ্রেমে সাজিয়ে রাখা হয়।

দাঁত নখ দেখবার সময় দাঁত মাজা, নখ কাটার প্রয়োজন সম্বন্ধেও আলোচনা হয়। সাধারণত একদিনের আলোচনা মনে থাকে না। তাই অন্যদিনে সেই আলোচনা উঠলে সে কথা লিখে রাখার প্রয়োজন সহজেই বুঝিয়ে দেওয়া যায়। শিক্ষক তখন সেই বিষয়ে দুই একটি কথায় কিছু লিখে দেন। সেই লেখা ক্লাসে টাঙানো থাকে। ছেলেরা তা পড়ে। এটা অবশ্য হয় দিনকতক পরে।

প্রতিদিনকার আবহাওয়ার সম্বন্ধেও আলোচনা হয়। একটি পঞ্জিকা করে দেওয়া হয়। তারও কার্ড আছে। বিত্তালয়ের সময়ের মধ্যে রোদ বৃষ্টি বাতাস যখন যেমন হয় ছেলে সেই কথা লেখা কার্ড পঞ্জিকার ফ্রেমে বসিয়ে দেয়। এইভাবে 'রোদ' 'বৃষ্টি' 'বাতাস' 'মেঘ' কথাগুলি সহজেই সে পড়তে শেখে। কথাগুলি শেখা হয়ে

গেলে আবহ-সংবাদ কেবল 'রোদ' 'বৃষ্টি' প্রভৃতি শব্দে আবদ্ধ না রেখে সম্পূর্ণ বাক্যে বোর্ডে লিখে দেওয়া হয়। যেমন—'আজ বৃষ্টি হয়েছে', 'কাল বৃষ্টি হয় নাই'।

এ ছাড়াও ছেলের চারিদিকে কোথায় কি আছে সেদিকে ছেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। নূতন ফুলফল, পোকামাকড় সব কিছুই তারা দেখতে শেখে। যা দেখে তার বিবরণ লিখে দেওয়া হয়। এই উপলক্ষে তারা কিছু কিছু নূতন কথা পড়তে শেখে।

এই সব ক্ষেত্রেই বার তারিখ না থাকলে কবেকার কথা তা বোঝা যাবে না। তাই সঙ্গে সঙ্গে বার তারিখের কার্ডও ব্যবহার করা হয়। কার্ড বসাবার সময় ছেলে সেই বার ও তারিখের কার্ড আগে বসায়। পরের দিন আলোচনার সময় সেই কার্ড মিলিয়ে দেখা হয়। এইভাবে খুব অল্প সময়ের মধ্যে ছেলে বার ও তারিখ পড়তে শেখে।

মাঠের কথা, হাটের কথা আলোচনার সময়ে একজনে সব কথা বলতে পারে না। এক একজন দুই একটা করে কথা বলে। লিখে না রাখলে তো মনে থাকবে না। তাই শিক্ষক যে যা বলে লিখে নেন। শেষকালে সবটা পড়িয়ে দেওয়া হয়। ছেলেরা তখন লিখতে শেখে লিখেও নেয়।

ছেলেদের নানারকম কাজ করতে হয়, যেমন—ঘর পরিষ্কার করা, শ্রেণী সাজানো, তুলা পেঁজা, তুলা ধোনা, পাঁজ করা, সুতা কাটা, বাগান করা, পুতুল গড়া, কাগজ থেকে ছবি কাটা ও বইয়ে আঁটা ইত্যাদি। প্রত্যেকটি কাজের আগে ছেলেকে কাজের পরিকল্পনা করানো এবং কাজের শেষে কাজের বিবরণ বলানো হয়। কয়েকদিন পরে কাজের বিবরণ খাতায় লিখতে শেখানো হয়। লিখে না রাখলে কবে কতখানি কাজ হল তা মনে থাকে না।

সেইজন্যই লেখার প্রয়োজন। এইভাবে ছেলেকে লেখার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে তার পর লিখতে দেওয়া হয়। লিখতে হলে শব্দগুলি চেনার প্রয়োজন। এর ভিতর দিয়ে ছেলে পড়তেও শেখে। শব্দ চেনা এইভাবে হয়।

কাজের পরিকল্পনা এবং বিবরণ লিখতে যেসব কথার প্রয়োজন হয় সেই কথাগুলির প্রত্যেকটি শব্দ আলাদা আলাদা কার্ডে লেখা থাকে। তারই এক সেট শিক্ষকের কাছে এবং এক সেট করে প্রত্যেক ছেলের কাছে থাকে। পরিকল্পনা করা হলে প্রথমে শিক্ষক নিজের সেট থেকে কার্ড নিয়ে দেয়ালে টাঙানো ফ্রেমে সাজান। তার পরে ছেলেরা নিজের কার্ড সাজায় এবং শিক্ষকের কার্ডের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে ঠিক ঠিক সাজানো হল কি না। পরিকল্পনার প্রথমেই সেদিনের বারের নাম ও তারিখ লেখা কার্ড সাজানো হয়। পরে কাজের কথা এবং কাজের প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের নাম ও সংখ্যা সাজানো হয়, যেমন—'সুতা কাটব', 'টাকু—১৫', 'পাঁজ—৩০', 'পাটা—১৫'। কাজের শেষে ঐ কার্ড দেখেই সরঞ্জাম মিলিয়ে তুলে রাখে। কাজ শেষ হয়ে গেলে 'সুতা কাটব' লেখা কার্ড সরিয়ে 'সুতা কেটেছি' কার্ড বসিয়ে দেওয়া হয়। এইভাবে প্রত্যেকদিন কার্ড নাড়াচাড়ার ফলে কাজ সম্পর্কিত কথাগুলি পড়তে শেখে।

ছেলে বাগানে গিয়ে কাজ করে। মাটি কোপানো, জমি তৈয়ারি করা, বীজ পোঁতা, গাছে জল দেওয়া, ফসল তোলা, এই ধরণের অনেক কাজ করতে হয়। কাজের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেকে গাছের ক্রম-বিকাশ লক্ষ্য করতেও শেখানো হয়। মাটি কোপানো থেকে আরম্ভ করে ফসল তোলা পর্যন্ত কোন্ কাজটির জন্য কতদিন সময় লাগল তার হিসাব রাখা হয়। দেয়ালে একটি চার্ট টাঙানো থাকে। সেই

চার্টে কোন্‌দিন মাটি কোপানো হল, কবে বীজ বোনা হল, কতদিন পরে গাছ বেরুল, এইসব বিবরণ লিখে রাখা হয়। এই বিবরণ থেকে ছেলে বুঝতে পারে বীজ বোনার কতদিন পরে গাছ বেরুল, কতদিনে ফুলফল হল এবং ফসল তুলতে কতদিন লাগল। এই উপলক্ষেও ছেলে নূতন নূতন অনেক কথা পড়তে শেখে।

ছেলেদের নিজের নিজের ব্যবহারের জন্য দেয়াল-পঞ্জিকা তৈয়ারি করতে শেখানো হয়। দেয়াল-পঞ্জিকাতে কবে কিসের ছুটি লেখা থাকে। এই উপলক্ষে সাত বার এবং মাসের নাম ছাড়াও ছুটি এবং উৎসবের কথা পড়তে শেখে।

ছেলেরা চিড়িয়াখানা করে। খবরের কাগজ বা পুরানো বই থেকে সেই ছবি কেটে জানোয়ারের ছবি সংগ্রহ করে। সেই ছবি এক একটি পিচবোর্ডে আঁটে। আলাদা আলাদা পিচবোর্ডে সেই-সব জানোয়ারের নাম লেখা থাকে। ছেলেরা ঐ জানোয়ারের ছবি আঁটা পিচবোর্ডগুলি দেয়ালে টাঙায় এবং নীচে নীচে জানোয়ারের নামের কার্ডগুলি লাগিয়ে দেয়, যেমন—গরুর ছবি টাঙিয়ে 'গরু'-লেখা কার্ডখানা নীচে ঝুলিয়ে দেয়। এইভাবে অনেক জানোয়ারের নাম খুব সহজেই পড়তে শেখে।

ছেলেদের এক একখানি কাগজে ছবি আঁকতে দেওয়া হয়। আঁকার শেষে শিক্ষক এক একজন করে ছেলেকে ডেকে সে কি এঁকেছে জেনে নিয়ে তার কাগজে লিখে দেন। ছেলে মুখে যা বলে তাই লেখা হয়। সে সেই কথা লেখার আকারে দেখে আপনা-আপনি সেগুলি পড়তে শেখে।

ছেলেদের যখন যে গল্পটি বলা হয় সেইটি আবার তাদের দিয়ে বলানো হয়। ছেলেরা বলতে পারে না। গল্পটি লিখে রাখলে সুবিধা হয়। তাই সেটি বড় বড় হরফে লিখে পিচবোর্ডে এঁটে

টাঙিয়ে দেওয়া হয়। কোন কোন গল্প ছেলেদের দিয়ে অভিনয়ও করানো হয়। অভিনয়ে নিজের নিজের অংশ বলতে হলে কথাগুলি মনে রাখার প্রয়োজন হয়। তাই সেগুলিও তাদের লিখে নিতে হয়। এই সবই ছেলেরা পড়ে।

ছেলেরা কবিতা ও ছড়া বলে। যে কবিতা বা ছড়াটি বলবে, সেইটিকে লিখে টাঙিয়ে দেওয়া হয়। নিজের আগ্রহেই তারা সেটি পড়ে। খুব অল্প সময়েই তারা কবিতা বা ছড়াটি পড়তে শিখে যায়।

ছেলেদের যে গানটি শেখানো হয়, সেই গানটি এইভাবে লিখে টাঙিয়ে দেওয়া হয়। গান গাইতে গেলেই গান মুখস্থ করা দরকার। গানের আগে খুব উৎসাহ করেই ছেলেরা গান পড়ে নেয়। এইভাবে সম্পূর্ণ গানটি পড়তে শেখে।

বুনিয়াদী বিত্থালয়ে সাধারণ নিয়মে অক্ষর-পরিচয় করানো হয় না। এখানে প্রয়োজন অনুসারে ছেলেকে প্রথমেই একটা গোটা শব্দ বা গোটা বাক্য শেখানো হয়। সেটা আয়ত্ত হয়ে গেলে তখন তার মধ্যেকার অক্ষর বিশ্লেষণ করে অক্ষর-পরিচয় করানো হয়। প্রচলিত বিত্থালয়ে বই পড়ার উপায় হিসাবে অক্ষর-পরিচয় করানো হয়। অক্ষরের প্রতি ছেলের স্বাভাবিক কোন আগ্রহ থাকে না। তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়, ভাল ছেলে হতে গেলে পড়তে জানা চাই এবং তার জন্য অক্ষর-পরিচয় করা দরকার। তাই সে অক্ষর শেখে। এইভাবে অক্ষর-পরিচয় করতে সময় লাগে এবং কাজও ভাল হয় না। তাই বুনিয়াদী বিত্থালয়ে এভাবে অক্ষর-পরিচয় করানো হয় না। পড়তে পড়তে পড়া আয়ত্ত হয়ে গেলে বার বার উচ্চারণের ফলে অনেক অক্ষর ছেলেরা নিজেরাই শিখে নেয়। আবার অনেক অক্ষর শিক্ষক শব্দ বিশ্লেষণ করে শিখিয়ে দেন।

—নয়—

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পড়া (২)

বুনিয়াদী বিদ্যালয় কাজের বিদ্যালয়। এখানে কাজের মাধ্যমে ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া হয়। তা ছাড়া ছেলের জীবনের সঙ্গে যোগ রেখে শিক্ষা দিতে হলে যে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের মধ্যে ছেলে জীবন যাপন করছে, সেই প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশকে অবলম্বন করেও শিক্ষা দিতে হয়। সেইজন্য বুনিয়াদী শিক্ষায় কাজ, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশ এই তিনটিই শিক্ষার কেন্দ্র। বুদ্ধির সঙ্গে কাজ করতে হলে কাজের বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে ছেলের সঙ্গে আলোচনা করতে হয়। তা ছাড়া ছেলের পরিবেশের মধ্যে যেসকল ঘটনা ঘটে সেই বিষয়েও ছেলেকে সচেতন করে দিতে হয়। মৌখিক আলোচনা ছেলের মনে থাকে না। তাই আলোচনার পরে তাকে লিখতে এবং পড়তে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়।

ছেলেরা সুতা কাটে, বাগান করে। এ ছাড়াও ছোটখাট অনেক কাজ করে। কাজ করতে গেলেই নানারকম প্রশ্ন এসে পড়ে। তখন সেইসব প্রশ্নের উত্তরে ছেলেকে অনেক কিছুই বলতে হয়। যেমন, সুতা কাটতে গেলে প্রথমেই আসে তুলার প্রশ্ন—তুলা কতরকম, কোন্ তুলা ভাল, ভাল তুলা কোথায় পাওয়া যায় ইত্যাদি। সুতা কাটার যন্ত্র সম্বন্ধেও জানতে হয়। যন্ত্রের কোন্ অংশের কি নাম, কোন্ অংশের কিরকম ত্রুটি থাকলে কি অসুবিধা হয়, এইগুলি কেমন করে দূর করা যায়

এবং এমনি আরও অনেক কিছু। বাগানের কাজ করতে গেলেও মাটি সার জল বীজ গাছ সব কিছু সম্বন্ধেই আলোচনা এসে পড়ে। অন্যান্য কাজ সম্বন্ধেও এই রকমের অনেক আলোচনার প্রয়োজন হয়।

তার পর প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশের কথা। প্রত্যেক ঋতুতে প্রাকৃতিক পরিবর্তন ও বিভিন্ন ঋতুর ফুল ফল পাখী পোকা-মাকড় ইত্যাদির দিকে ছেলেদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় এবং এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। তা ছাড়া বিভিন্ন ঋতুতে আকাশবাতাসের অবস্থা, দিনরাতের হ্রাসবৃদ্ধি, আবহাওয়ার পরিবর্তন প্রভৃতির সম্বন্ধে ছেলেদের সচেতন করা হয়। প্রসঙ্গক্রমে ঋতুর পরিবর্তন কেমন করে হয়, দিনরাতের হ্রাসবৃদ্ধি কেন হয়, ভিন্ন ভিন্ন ফসলের উপরে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুর প্রভাব, এইসব সম্বন্ধেও আলোচনা হয়।

ছেলে যে সমাজে বাস করে সেখানকার রাস্তাঘাট, হাটবাজার, পালপার্বণ প্রভৃতির সঙ্গে ছেলের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। তা ছাড়া ডাক, রেল, ইউনিয়ন বোর্ড, জেলা বোর্ড এবং গভর্ণমেণ্ট প্রভৃতির সম্বন্ধেও ছেলেকে বলা হয়।

সমাজে উৎসব পালনের রীতি আছে। বিস্তালয়ও ছেলেদের সমাজ। যে সমাজে ছেলেকে বড় হয়ে বাস করতে হবে তারই অনুরূপ একটি ছোট সমাজ হল বিস্তালয়। এখানেও ছেলেরা উৎসব পালন করে। উৎসব পালন উপলক্ষে উৎসবের পরিকল্পনা, উৎসবের আয়োজন ও অনুষ্ঠান এবং উৎসবের হিসাব ও বিবরণ সবই ছেলেদের শিক্ষার অঙ্গ। বিস্তালয়ে উৎসব অনেকরকম— সামাজিক উৎসব, যেমন নবান্ন; মহাপুরুষের জন্মোৎসব, যেমন গান্ধীজয়ন্তী; জাতীয় উৎসব, যেমন স্বাধীনতাদিবস; এবং ঋতু-

উৎসব, যেমন বর্ষামঙ্গল। এইসব উৎসব উপলক্ষে ছেলেদের অনেক কাজ করতে হয় এবং সেই কাজের প্রসঙ্গে অনেক বিষয়ে আলোচনা হয়।

কি কাজ, কি প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ, সকল বিষয়েই যখন যে ঘটনা ঘটে তখন সেই ঘটনা সম্পর্কে প্রথমে আলোচনা করা হয়। আলোচনার পর প্রয়োজন অনুসারে সেই বিষয়ে কিছু পড়ানো হয়। সকলের শেষে আলোচিত ও পঠিত বিষয় সম্বন্ধে লিখতে দেওয়া হয়। নিজেদের লেখা ছেলেরা পড়ে শোনায়। এইভাবে আরও খানিকটা পড়া হয়।

এই কাজ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভিন্নভাবে করানো হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর পড়ার অভ্যাস খুব বেশি নাই। তাই কোন একটা বিষয়ে আলোচনা হয়ে গেলে শিক্ষক সংক্ষেপে কয়েকটি কথায় সেই বিষয়টি বড় বড় ছাপার হরফে লিখে পিচবোর্ডে এঁটে টাঙিয়ে দেন। ছেলেরা তাই পড়ে। ছেলেদের পড়ার উন্নতির সাথে সাথে পড়ার বিষয়বস্তুও ক্রমশ বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

তৃতীয় শ্রেণী একটু বেশি পড়তে পারে। তাই আলোচনা হয়ে গেলে সেই বিষয়টি যদি কোন বইয়ে সহজ ভাষায় লেখা থাকে, তা হলে সেই বই থেকে তা পড়িয়ে দেওয়া হয়। যেমন, শীতকালে শিশির পড়েছে। সেদিন শিশির সম্বন্ধে আলোচনা হল এবং পরে রবীন্দ্রনাথের সহজপাঠ থেকে সেই বিষয়টি পড়তে দেওয়া হল। যে বিষয়টি তৃতীয় শ্রেণীর উপযুক্ত সহজ ভাষায় বইয়ে না পাওয়া যায়, সেটির সম্বন্ধে শিক্ষক বোর্ডে লিখে দেন। বোর্ডের লেখা বেশিক্ষণ থাকবে না। কাজেই বিষয়টি পড়া হয়ে গেলে ছেলেরা লিখে নেয়। এইভাবে প্রত্যেক ছেলে নিজের বই তৈয়ারি করে নেয়।

প্রায় ক্ষেত্রেই ছেলে শিক্ষকের রচনা নিজের বইয়ে লিখে নিলেও কখনও কখনও এমনও হয় যে, কোন একটা বিষয় পড়া হয়ে গেলে প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে বিষয়টি ছেলেকে দিয়ে বলিয়ে নিয়ে পরে লিখতে দেওয়া হয়। শিক্ষক এমন করে পর পর প্রশ্ন করেন যেন সেই প্রশ্নের উত্তরে গোটা বিষয়টি ছেলের লেখা হয়ে যায়। শিক্ষক সেটি সংশোধন করে দিলে ছেলে নিজের বইয়ে লিখে নেয়। এ ছাড়া সহজ সহজ কবিতাও ছেলেরা পড়ে। সেই পড়াও অবশ্য ঘটনাকে অবলম্বন করেই হয়।

চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্রেণীর ছেলেদের পড়ানোর পদ্ধতি প্রায় একই ধরণের। তবে এখানে আলোচনাটা দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর তুলনায় একটু বিস্তৃতভাবে করা হয়। আলোচনার শেষে ঐ বিষয়ে বই পড়তে দেওয়া হয়। বই পড়া হয়ে গেলে আলোচনার বিষয়বস্তুটি ছেলে লেখে। শিক্ষক সেই লেখা সংশোধন করে দিলে ছেলে নিজের তৈয়ারি বইয়ে লেখাটি তুলে নেয়। যেমন, একটি ছেলে একদিন একটি কাঁকড়া-বিছা ধরে এনেছে। কাঁকড়া-বিছা অনেকেই দেখে নাই। তাই আতস-কাচের সাহায্যে বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিভাগ সহ কাঁকড়া-বিছাটি সকলকে দেখানো হল এবং তার পর তাকে স্পিরিটের মধ্যে রেখে দেওয়া হল। পরে কাঁকড়া-বিছার জীবন সম্বন্ধে বিশদ-ভাবে আলোচনা হল। আলোচনা হয়ে গেলে জগদানন্দ রায়ের পোকামাকড় বই থেকে কাঁকড়া-বিছার অংশটি পড়িয়ে দেওয়া হল। পড়া হয়ে গেলে ছেলেরা কাঁকড়া-বিছা সম্বন্ধে লিখল। শিক্ষক লেখা সংশোধন করে দিলেন। সেই সংশোধিত লেখাটি ছেলেরা নিজের বইয়ে তুলে নিল। প্রত্যেকটি ঘটনাকে অবলম্বন

করেই এইভাবে ছেলেরা পড়ে এবং লেখে। পরে প্রয়োজন হলে সেই লেখাই আবার তারা পড়ে নেয়।

ছেলেদের দিনলিপি লিখতে উৎসাহিত করা হয়। তারা প্রতিদিনকার কাজ এবং শিক্ষার কথা নিজের নিজের দিনলিপিতে লেখে এবং কি লিখল শিক্ষককে পড়ে শোনায়। এইভাবেও খানিকটা পড়া হয়। সপ্তাহের শেষে এবং মাসের শেষে ছেলেদের সাপ্তাহিক এবং মাসিক কাজের বিবরণ তৈয়ারি করতে হয়। সেই সময়ে আগেকার দিনলিপি ছেলেদের পড়ে নিতে হয়। বিবরণ তৈয়ারি হয়ে গেলে সমস্ত শ্রেণীর সাপ্তাহিক এবং মাসিক বিবরণ একসঙ্গে টাঙিয়ে দেওয়া হয়। কোন্ শ্রেণী কতখানি কাজ করেছে, স্বাভাবিক কৌতূহলবশত ছেলেরা পড়ে।

উৎসব পালনের সময়ও খানিকটা পড়া হয়। উৎসব উপলক্ষে ছেলেরা আবৃত্তি করে এবং অভিনয় করে। এইগুলিও লিখে নিয়ে পড়তে হয়। মহাপুরুষদের জন্মদিন পালন উপলক্ষে ছেলেরা তাঁদের জীবনী পড়ে। পড়ার পরে মহাপুরুষদের সম্বন্ধে যার যে গল্প ভাল লাগে লিখে নিয়ে অনুষ্ঠানে পড়ে।

প্রত্যেক মাসে একদিন করে ছেলেদের ওজন নেওয়া হয় এবং আগের মাসের ওজনের সঙ্গে তুলনা করা হয়। সকলের ওজন নিজের নিজের দিনলিপিতে লেখা থাকে। ঐ দিনটিতে স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং ঐ সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রাচীরপত্র দেয়ালে টাঙিয়ে দেওয়া হয়। প্রাচীরপত্র ছবির সঙ্গে লেখা থাকে। ছেলেরা উৎসাহের সঙ্গে সেইসব প্রাচীরপত্র পড়ে।

গ্রামে কোন অসুখ দেখা দিলে সেই অসুখ সম্বন্ধে আলোচনা

করা হয়। চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্রেণীর ছেলেরা সেই বিষয়ে বই পড়ে এবং অসুখের কারণ ও নিবারণের উপায় সম্বন্ধে প্রাচীরপত্র তৈয়ারি করে। সেইসব প্রাচীরপত্র দেয়ালে টাঙিয়ে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর ছেলেরা সেইগুলি পড়ে।

সমস্ত শ্রেণীতে কাজ প্রায় এক। প্রাকৃতিক এবং সামাজিক ঘটনাও এক। তাই সকল শ্রেণীতে একই বিষয়ে আলোচনা এবং পড়ানো হয়। প্রভেদ কেবল এই, শ্রেণী অনুসারে আলোচনা এবং পড়ানোর ইতরবিশেষ হয়ে থাকে। ছোট ছেলেদের কাছে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয় এবং পড়ার বিষয়বস্তুও সংক্ষিপ্ত থাকে। ছেলেরা যত বড় হয় তাদের কাছে আলোচনাও তত বিস্তৃতভাবে করা হয় এবং পড়ার বিষয়বস্তুও ততই বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

ছেলেরা স্বভাবতই গল্প শুনতে ভালবাসে। শিক্ষক গল্প বলেন, সময়ে সময়ে কোন বই থেকে পড়েও শোনান। ছেলেদের হাতে গল্পের বই দিয়ে তাদের পড়তে উৎসাহিত করেন। দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে ছেলেরা বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার থেকে বই নিয়ে পড়তে আরম্ভ করে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর ছেলেরা বিদ্যালয়ে বসেই পড়ে। চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্রেণীর ছেলেরা বাড়ীতেও বই নিয়ে যায় এবং সপ্তাহে অন্তত দুদিন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে পড়ে।

ছেলেরা গান শেখে। গানগুলি তাদের লিখে দেওয়া হয়। উপরের শ্রেণীতে নিজেরাই লিখে নেয়। এই লেখা গান তারা মুখস্থ করে।

ছেলেদের মনে সাহিত্যরসবোধ জাগাবার জন্য এবং সৎসাহিত্যের সঙ্গে তাদের পরিচিত করবার জন্য প্রত্যেক মাসে

একদিন করে সাহিত্যসভা হয়। সাহিত্যসভাতে ছেলেরা গল্প পড়ে, কবিতা পড়ে, অভিনয় করে। এইভাবেও অনেকটা পড়া হয়।

বিদ্যালয়ের সাপ্তাহিক সংবাদপত্র আছে। বড় ছেলেরা হাতে লিখে এই সংবাদপত্র বার করে। সংবাদপত্রে বিদ্যালয়ের গ্রামের এবং দেশবিদেশের বড় বড় খবরগুলি লেখা হয়। ছেলেরা প্রতিদিন সংবাদপত্র পড়ে দেশবিদেশের খবর সংগ্রহ করে এবং বিদ্যালয়ের সংবাদপত্র লেখে। সংবাদপত্র দেয়ালে টাঙিয়ে দেওয়া হলে বিদ্যালয়ের অন্যান্য ছেলেরা সেইসব সংবাদ পড়ে।

সংবাদপত্র ছাড়াও বিদ্যালয়ের ত্রৈমাসিক কাগজ আছে। বিদ্যালয়ের সকল ছেলেই এই কাগজ পড়ে। এইভাবে সংবাদ এবং ত্রৈমাসিক কাগজ পড়া উপলক্ষেও ছেলেদের খানিকটা পড়া হয়।

এইভাবে নানা বিষয়কে অবলম্বন করে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছেলেরা পড়তে শেখে। কোন নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজন হয় না। নিজেদের প্রয়োজনে পড়ে বলে পড়ায় তাদের আগ্রহ থাকে এবং পড়ার বিষয়বস্তুও তারা সহজেই বুঝতে ও মনে রাখতে পারে।

—দশ—

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে লেখা

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ছেলে লিখতে শেখে তার নিজের প্রয়োজনে। বুনিয়াদী বিদ্যালয় কাজের বিদ্যালয়। কাজ করতে গেলেই তার হিসাব রাখতে হয়। মুখে মুখে হিসাব করলে মনে থাকে না। তাই হিসাব লিখে রাখতে হয়। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ছেলের লেখার সূত্রপাত হয় তার কাজের হিসাবকে উপলক্ষ করে।

আমাদের বিদ্যালয়ের প্রধান কাজ হল সুতা কাটা। এই সুতার হিসাব রাখতে হয়। প্রত্যেক ছেলের দিনলিপির খাতা আছে। সেই খাতায় সে কোন্ দিন কতখানি সুতা কাটল তার হিসাব লেখা থাকে। দিনলিপিতে নাম লেখা না থাকলে কার কোন্ খাতা চেনা যাবে না। তাই ছেলেকে নিজের নাম লিখতে শিখতে হয়। দিনের পরিচয়ের জন্য বার তারিখ লেখার প্রয়োজন হয়। সেইজন্য ছেলে বার ও তারিখ লিখতে শেখে। প্রথমে শেখে বারের নাম। কিছুদিন পরে বারের সঙ্গে তারিখও লিখতে শেখে।

প্রথমেই সুতার হিসাব সম্পূর্ণ কথায় লিখতে পারে না, সংক্ষেপে লেখে। পরে একটু, তার পরে আর একটু, এইভাবে ক্রমশ সম্পূর্ণ বাক্যটি লিখতে শেখে। যেমন, প্রথমে '৭', তার পর '৭ তার', তার পর '৭ তার সুতা', তার পর '৭ তার সুতা কেটেছি', তার পর 'আমি ৭ তার সুতা কেটেছি', তার পর 'আজ আমি ৭ তার সুতা কেটেছি'।

প্রথমে ছেলেকে সুতা কাটা শেখানো হয়। সুতা কাটা মোটামুটি অভ্যাস হয়ে গেলে ক্রমশ তুলা পেঁজা, তুলা ধোনা এবং পাঁজ করা শেখে। সুতা কাটার মত এইসব কাজেরও হিসাব রাখতে হয়। অনুরূপ প্রণালীতে একটু একটু করে ছেলে তার হিসাব লিখতে শেখে। পেঁজা এবং ধোনা ও পাঁজ করার কাজ ছেলেকে একসঙ্গে আরম্ভ না করিয়ে পর পর আরম্ভ করানো হয়। পেঁজার হিসাব লিখতে শিখলে তবে ধোনা ও পাঁজ করার কাজ আরম্ভ করে।

তুলা পিঁজবার পূর্বে ছেলে খানিকটা তুলা ওজন করে নেয়। পিঁজবার সময়ে খারাপ তুলা এবং তুলার সঙ্গে যে ময়লা থাকে তা বেছে বাদ দিতে হয়। এইটা নষ্ট হয়। পেঁজার পর ছেলে আর একবার ওজন করে দেখে কতখানি ভাল তুলা পাওয়া গেল এবং কতখানি তুলা নষ্ট হল। হিসাব রাখার সময়ে ছেলে প্রথমে কেবলমাত্র মোট তুলার পরিমাণটিই লেখে। পরে ক্রমে কতটা ভাল তুলা হল এবং কতটা তুলা নষ্ট হল তাও লেখে।

ধোনার সময়েও ছেলে তুলা ওজন করে নেয়। ধুনতে গিয়েও কিছু তুলা নষ্ট হয়। ধোনার পর পাঁজ করে ছেলে আর একবার ওজন করে দেখে কতটা পাঁজ হল। পাঁজের সংখ্যাও গুনে দেখে। ধোনার হিসাব রাখার সময় ছেলে প্রথমে মোট তুলার পরিমাণ এবং তার পর ক্রমে ভাল তুলা ও নষ্ট তুলার পরিমাণ ও পাঁজের সংখ্যা লেখে। এইভাবে সুতা ও তুলার হিসাব উপলক্ষে ক্রমশই নূতন নূতন কথা লিখতে শেখে।

সুতা কাটা ছাড়াও বাগানের কাজ আছে। ছেলে বাগানে গিয়ে কাজ করে। অনেক রকমের কাজ করতে হয়—মাটি

কোপানো, জমি তৈয়ারি করা, বীজ পোঁতা, গাছে জল দেওয়া, ফসল তোলা। কাজের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেকে গাছের ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করতেও শেখানো হব। বাগানের কাজ করে ছেলে দিনলিপিতে তার বিবরণ লেখে। প্রথমে কোন্ দিন কি কাজ করল তার বিবরণ ও তার পর ক্রমশ গাছের বিবরণ লিখতে শেখে। এই বিবরণ থেকে ছেলে বুঝতে পারে বীজ বোনার কদিন পরে গাছ বেরুল, কত দিনে ফুল ফল হল এবং ফসল উঠতে কত দিন লাগল। এই উপলক্ষেও ছেলে অনেক নূতন কথা লিখতে শেখে।

প্রতিদিন কাজ করবার পূর্বে কাজের সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। কোন্ দিন কি কাজ হবে তার পরিকল্পনা এবং কোন্ কাজ করতে কি জিনিস কটা লাগবে তার হিসাব করা হয়। পাছে মনে না থাকে এইজন্য এই পরিকল্পনা এবং হিসাব লিখে রাখা হয়। কাজের শেষে ছেলে এই হিসাব দেখে সব জিনিস মিলিয়ে তুলে রাখে। প্রথম প্রথম এই পরিকল্পনা এবং হিসাব শিক্ষক লিখে দেন। পরে ছেলেরা আস্তে আস্তে নিজেরা লিখতে শেখে। এইভাবে তারা তাদের প্রাত্যহিক কাজে যেসব জিনিসের প্রয়োজন হয় তার নাম লিখতে শেখে।

যত দিন যায় হিসাবের পরিমাণ বাড়তে থাকে। প্রথমে নিজের হিসাব, পরে সারের হিসাব, তার পর শ্রেণীর হিসাব। প্রথমে দিনের হিসাব, পরে সপ্তাহের হিসাব, তার পর মাসের হিসাব। পরিকল্পনাও বাড়ে। প্রথম প্রথম ছেলে শুধু দিনের কাজেরই পরিকল্পনা করে। তার পর ক্রমশ সপ্তাহের কাজের এবং মাসের কাজেরও পরিকল্পনা করতে শেখে। সমস্ত হিসাব এবং পরিকল্পনাই লিখে রাখতে হয়। এই উপলক্ষেও কিছু কিছু নূতন কথা ছেলে লিখতে শেখে।

হিসাব রাখতে গেলেই বার তারিখ জানার প্রয়োজন হয়। শিক্ষক ছেলেকে দেয়াল-পঞ্জিকা থেকে বার তারিখ—প্রথমে কেবল বাঙলা, পরে বাঙলা ইংরেজী দুই তারিখই—দেখতে শিখিয়ে দেন। ক্রমশ তাকে দেয়াল-পঞ্জিকা তৈয়ারি করে নিতে শেখানো হয়। সকল ছেলেই নিজ নিজ ব্যবহারের জন্য প্রত্যেক মাসের দেয়াল-পঞ্জিকা করে নেয়। ছোটদের পঞ্জিকায় শুধু বাঙলা তারিখ এবং বড়দের পঞ্জিকায় বাঙলা ইংরেজী দুই তারিখই থাকে। এই উপলক্ষে তারা বার তারিখ ছাড়াও উৎসব এবং ছুটির কথা লিখতে শেখে।

কাজ ছাড়াও ছেলেদের তাদের চারদিকে কোথায় কি আছে লক্ষ্য করে দেখতে শেখানো হয়। নূতন গাছপালা, নূতন ফুল-ফল, নূতন পোকামাকড়, নূতন পশু-পাখী, সব কিছুই তারা দেখতে শেখে। যা দেখে তার বিবরণ লিখে রাখতে তাদের উৎসাহ হয়। প্রকৃতি-পরিচিতিতে তারা এইসব লিখে রাখে। শিক্ষক লিখে দেখিয়ে দেন, তাই দেখে দেখে তারা নিজেরা লেখে। প্রথম প্রথম যা দেখল তার নামটুকুই শুধু লেখে। পরে সংক্ষেপে তার বিবরণও লেখে। এইভাবে তারা অনেক নূতন কথা লিখতে শেখে।

ছেলেদের প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশের মধ্যে কখন কি ঘটছে সেদিকেও তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। প্রায় প্রতিদিনই এই রকমের কোন না কোন বিষয় নিয়ে শিক্ষক ছেলেদের সঙ্গে আলোচনা করেন। মেঘ-রৌদ্র, ঝড়-বৃষ্টি, হাট-বাজার, উৎসব-আনন্দ, অনেক কিছুর সম্বন্ধেই আলোচনা হয়। যা আলোচনা হয় তা পাছে ভুলে যায় সেইজন্য ছেলেকে লিখে রাখতে উৎসাহ দেওয়া হয়। প্রথমে শিক্ষক সংক্ষেপে আলোচনার সারাংশ বোর্ডে লিখে দেন,

ছেলেরা দেখে দেখে লেখে। পরে ছেলেরা নিজেরাই লিখতে পারে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে সাধারণত শিক্ষকের লেখা দেখে লেখে এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে স্বাধীনভাবে লেখে। তৃতীয় শ্রেণীতে সংক্ষেপে দু-চার কথা লেখে। চতুর্থ শ্রেণীতে আলোচিত বিষয় প্রায় পুরাপুরিই লিখতে পারে। ছেলেরা এক একটি পৃথক খাতায় এইগুলি লেখে এবং সেইগুলি ক্রমশ এক-একখানি বইয়ে পরিণত হয়। ছেলেদের এইভাবে নিজের বই তৈয়ারি করে নিতে উৎসাহিত করা হয়।

এ ছাড়াও ছেলেদের নিজেদের ইচ্ছামত গল্প প্রভৃতি লিখতে উৎসাহ দেওয়া হয়। ছোটরা যা দেখেছে বা শুনেছে তারই সম্বন্ধে লেখে। বড়রা নিজেদের মন থেকেও একটু আধটু লিখতে পারে।

প্রত্যেক শ্রেণীর ছেলেদের লেখার কিছু নমুনা এইখানে দেওয়া হল। আমাদের বিদ্যালয়ে এতদিন চারিটি শ্রেণী ছিল। সেইজন্য মাত্র চার শ্রেণীর লেখার নমুনাই দিতে পারলাম।

প্রথম শ্রেণী

পরিকল্পনা : সোমবার। সুতা কাটব। টাকু চাই। পাঁজ চাই। টাকু—১০। পাঁজ—২০। গাছে জল দেব। বালতি চাই। মগ চাই। বালতি—৫। মগ—৫।

দিনলিপি : বুধবার। আমি ৪০ তার সুতা কেটেছি। তুলা পিঁজেছি। গাছে জল দিয়েছি।

প্রকৃতি-পরিচিতি : শনিবার, ২৪ মাঘ। কাঁকড়া-বিছা। অসিত।

আলোচনা : কাল রথ। আমরা রথ দেখতে যাব। পুতুল কিনব। খাবার খাব।

দ্বিতীয় শ্রেণী

পরিকল্পনা : সাপ্তাহিক : ১২ জ্যৈষ্ঠ—১৮ জ্যৈষ্ঠ। কাজের দিন—৫। কাজের সময়—১২॥ ঘণ্টা। সুতার কাজ—১১ ঘণ্টা। বাগানের কাজ—১॥ ঘণ্টা। আমি ১০৬০ তার সুতা কাটব। ৩ দিন ॥ ঘণ্টা করে বাগানের মাটি খুসব।

দৈনিক : সোমবার, ১২ জ্যৈষ্ঠ। ৬-৬॥—লেখা—প্রকৃতি-পরিচিতি। ৬॥-৭—বাগান। ৭-৭॥—পড়া, কবিতা। ৭॥-৯॥—ধোনা, কাটা। ৯॥-১০—গান। ১০-১০॥—হিসাব। ১০॥-১১—দিনলিপি।

দিনলিপি : দৈনিক : সোমবার ১২ জ্যৈষ্ঠ। আমি ৻১৷ তুলা ধুনেছি। নষ্ট হয়েছে ৻/। ১৬টা পাঁজ হয়েছে। ২৫০ তার সুতা কেটেছি। আমাদের শ্রেণী //২৷ তুলা ধুনেছে। ১৫৮০ তার সুতা কেটেছে।

সাপ্তাহিক : ১২ জ্যৈষ্ঠ—১৮ জ্যৈষ্ঠ। নিজের কাজ : কাজের দিন—৫। উপস্থিতি—৫ দিন। মোট ধোনা—//১।। মোট সুতা ১০৫০ তার। শ্রেণীর কাজ : কাজের দিন—৫। ছাত্রসংখ্যা ৭। মোট ধোনা /।/। মোট সুতা—৮০২৪ তার। মন্তব্য : সকলে প্রতিদিন আসে নাই। সুতা কম হয়েছে।

প্রকৃতি-পরিচিতি : বুধবার, ১৩ চৈত্র। পেয়ারা। স্কুলের বাগানে। সুষমা বারিক।

আলোচনা : জল খুব গরম হলে বাষ্প হয়ে বাতাসে মিশে যায়। এই বাষ্প জমে ঘন হয়ে মেঘ হয়। মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়।

গল্প : আমাদের একটি ছাগল ছিল। সে একদিন ঘাস খেতে খেতে তার গলায় ঘাস বেধে গেল। সে চেঁচাতে লাগল। আমি গিয়ে গলা থেকে ঘাস বার করে দিলাম। ছাগলটা বেঁচে গেল।

তৃতীয় শ্রেণী

পরিকল্পনা : দ্বিতীয় শ্রেণীর মত।

দিনলিপি : দৈনিক : বৃহস্পতিবার, ১০ নভেম্বর। শ্রেণীর কাজ : উপস্থিতি—৬। মোট সময়—৫ ঘণ্টা। কাজ—২॥ ঘণ্টা। লেখাপড়া—২ ঘণ্টা। গান—॥ ঘণ্টা। মোট ধোনা—/৩॥। মোট সুতা—৩ গুণ্ডি ৪৩৮ গজ। গড় সুতা—৫০০ গজ। মোট আয় —।৶১৫। গড় আয়—/৫। নিজের কাজ : ধোনা—৲১। কাটা —৫৬০ গজ। আয় /১০।

সাপ্তাহিক : ১ নভেম্বর—৭ নভেম্বর। শ্রেণীর কাজ : কাজের দিন—৬। ছাত্রসংখ্যা—৬। গড় উপস্থিতি ৪·৬। মোট ধোনা—/।৶। মোট সুতা—১৯ গুণ্ডি ৫৭০ গজ। মোট আয়—২৸০। গড় আয়—॥/১০। নিজের কাজ : উপস্থিতি—৬ দিন। মোট ধোনা—//১। মোটসুতা—৩ গুণ্ডি ৪৩০ গজ। আয়—।৶০।

প্রকৃতি-পরিচিতি : বুধবার, ৯ নভেম্বর। গাঁদা ফুল। নিভাদের বাগানে। এ বছর এই প্রথম গাঁদা ফুল দেখলাম। প্রতিভা মণ্ডল।

আলোচনা : কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ দুই মাস হেমন্ত কাল। এই সময়ে হিম পড়ে। তাই এই দুই মাসকে হেমন্ত বলে। হেমন্ত কালে যে ধান হয় তার নাম হৈমন্তিক ধান। অগ্রহায়ণ মাসে এই ধান কাটে। নূতন ধানে নবান্ন হয়। এই সময়ে পালং শাক মূলা কপি ও টমাটো লাগানো হয়। এই সময়ে গোলাপ গাছের গোড়া খুঁড়ে দিতে হয়।

গল্প ঃ আমাদের পাড়ায় একটি খাল আছে। খালটি বেশ কুলু কুলু করে বয়ে যায়। ঠিক যেন একটি লোক গান গাইছে। খালটির ধারে ধারে গাছ আছে। সেই খালে শরৎকালে শাপলা ফোটে। গ্রীষ্মকালে খালটার জল শুকিয়ে যায়।

চতুর্থ শ্রেণী

পরিকল্পনা এবং দিনলিপি ঃ তৃতীয় শ্রেণীর মত।

প্রকৃতি-পরিচিতি ঃ বৃহস্পতিবার, ২৫ মে। বউ কথা কও পাখীর ডাক শুনেছি। পাখী দেখতে পাই নাই। বিশ্বনাথ বারিক।

আলোচনা ঃ সূর্য। সূর্য পৃথিবীর চেয়ে প্রায় ১৪ লক্ষ গুণ বড় এবং পৃথিবী থেকে প্রায় ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে আছে। দূরে আছে বলে আমরা সূর্যকে সামান্য থালার মত মনে করি।

সূর্য না থাকলে পৃথিবীতে কোন প্রাণী বাঁচত না এবং গাছপালা হত না। কেননা গাছপালা ছাড়া কোন প্রাণী বাঁচে না। তা ছাড়া, সূর্যের তাপে রোগের জীবাণু নষ্ট করে এবং নানাপ্রকার দুর্গন্ধ দূর হয়।

পৃথিবীতে যে বৃষ্টি হয় তার মূল কারণ হচ্ছে সূর্য। সাগর নদী পুকুর খাল ও বিলের জল সূর্যের তাপে বাষ্প হয়ে আকাশে ঘুরে বেড়ায়। সেইখানে ঠাণ্ডার সংস্পর্শে এসে আরও ঘন এবং ভারি হয়ে যায়। তখন জলের আকারে পৃথিবীতে পড়ে। তখন আমরা তাকে বলি বৃষ্টি। বৃষ্টি না হলে সৃষ্টি বাঁচত না।

গল্প ঃ আমাদের একটি কুকুর ছিল। কুকুরটি বড় কামড়াত। তাই আমাদের বাড়ীতে কেউ আসতে চাইত না। একদিন আমাদের

বাড়িতে সিন্নি হচ্ছে। অনেক লোক এসেছে সিন্নি দেখতে। এমন সময় কুকুরটি একটি মেয়েকে কামড়াল। সেইজন্য তারা সবাই আমাদের বলল, গাড়িতে তুলে দিয়ে এস। তাই আমরা কুকুরটিকে গাড়িতে তুলে দিয়ে এলাম। তারপর কুকুরটি যে কোথায় গেল তা আমরা জানি না।

—এগার—

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে গণিত

প্রচলিত বিদ্যালয়ে প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য গণিতের নির্দিষ্ট পাঠ্য-তালিকা আছে। সেই অনুযায়ী ছেলেদের গণিত শিক্ষা দেওয়া হয়। বুনিয়াদী বিদ্যালয়েও কোন্ শ্রেণীতে কতটা গণিত শিক্ষা দেওয়া হবে তার একটা পাঠ্যতালিকা আছে। দুইয়ের মধ্যে তফাত হচ্ছে এই—প্রথম ধরণের বিদ্যালয়ে ছেলের জীবনের সঙ্গে গণিত শেখার কোন যোগ নাই ; দ্বিতীয় ধরণের বিদ্যালয়ে ছেলে গণিত শেখে দৈনিক কাজের প্রয়োজনে, তার লব্ধ অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করে।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ছেলেদের বয়স অনুসারে প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য কাজ ঠিক করা আছে, এবং কোন কাজকে অবলম্বন করে গণিতের কোন্ অংশ শিক্ষা দেওয়া হবে তারও একটি পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ছেলেকে কাজ করতে দেওয়া হয় এবং সেই প্রসঙ্গে তাকে গণিত শেখানো হয়।

বিভিন্ন কাজকে অবলম্বন করেই ছেলে গণিত শেখে। কিন্তু গণিতের বেশি অংশটাই শেখে সুতা কাটাকে অবলম্বন করে।

প্রথম শ্রেণীতে ছেলেরা যখন ভর্তি হয় তখন থেকেই তারা যাতে সামর্থ্যানুযায়ী নিজেদের কাজ নিজেরা করতে পারে তার জন্য চেষ্টা করা হয়। প্রতিদিন বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হওয়ার

১৫ মিনিট আগে শ্রেণীর শিক্ষক ছেলেদের সাহায্যে শ্রেণী সাজিয়ে রাখেন। সেই সময়ে বসবার আসন পাতা উপলক্ষে হিসাব হয়, কতজন ছেলে এসেছে এবং তার জন্য কতখানা আসন চাই। এখানেই গোনার সূত্রপাত হয়। বিদ্যালয় আরম্ভ হয়ে গেলে প্রথমেই শিক্ষকের কাজ হল ছেলেদের পরিচ্ছন্নতা দেখা। এই প্রসঙ্গে শিক্ষকের সাহায্যে ছেলেরাই হিসাব করে, কতজন ছেলে এসেছে, তার মধ্যে কতজন দাঁত মেজেছে, কতজন মাজে নাই; কতজন স্নান করেছে, কতজন স্নান করে নাই ইত্যাদি। হিসাবের পরে উপস্থিত ছেলের এবং কতজন দাঁত মেজেছে ও কতজন মাজে নাই ইত্যাদির বিবরণ সংখ্যা লেখা কার্ডের সাহায্যে দেয়ালে টাঙানো ফ্রেমে সাজিয়ে রাখে। এইভাবে গুনতে শেখার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা সংখ্যা চিনতেও শেখে।

সংখ্যা লেখা কার্ড ফ্রেমে বসাবার আগে প্রতিদিনই সেদিনের তারিখ লেখা কার্ড বসিয়ে দিতে হয়। পরের দিন আবার অনুরূপ হিসাব হয়ে গেলে আগের দিনের হিসাবের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে, কোন্ দিন বেশি ছেলে এসেছে এবং কত বেশি এসেছে; কোন্ দিন বেশি ছেলে দাঁত মেজেছে ইত্যাদি। এর মধ্য দিয়ে ছেলে মুখে মুখে বিয়োগ করতে শেখে।

বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার এক মাস পরে ছেলেকে সুতা কাটতে দেওয়া হয়। প্রত্যেক কাজের আগে কাজের জন্য কোন্ কোন্ জিনিস চাই এবং কতটা চাই তার একটা পরিকল্পনা করা হয়। সুতা কাটবার আগেও সেইরকম পরিকল্পনা করা হয়। প্রথমে হিসাব হয় কতজন ছেলে এসেছে। শিক্ষকের সাহায্যে ছেলেরাই গুনে দেখে। সুতা কাটবার জন্য টাকু পাঁজ ও পাটার দরকার

হয়। উপস্থিত ছেলের সংখ্যা লেখা কার্ড দেয়ালের ফ্রেমে বসিয়ে দিয়ে তার নীচে নীচে জিনিসের নাম ও সংখ্যা কার্ডের সাহায্যে সাজিয়ে রাখে। যেমন,

১৫ জন এসেছে
১৫ টাকু চাই
১৫ পাটা চাই
৩০ পাঁজ চাই

সুতা কাটা শেষ হলে সুতা নাটাইয়ে গুটাতে হয়। নাটাইয়ের মাপ ৪ ফুট। ৪ ফুট সুতাকে ১ তার বলে। এমনি ৪০ তার সুতাকে একসঙ্গে বাঁধা হয়। তাকে বলে পাটি। প্রথম শ্রেণীতে ছেলেরা একবারে ৩০ গুনতে পারে না। তাই এই শ্রেণীতে ১০ তারে ১ পাটি বাঁধতে দেওয়া হয়। সুতা গুটাবার আগে ছেলেকে গুনে দেখতে হয়, আগের দিনের কত তার সুতা নাটাইয়ে আছে। তার পর গুটাতে দেওয়া হয়। যেমন, গুনে দেখা গেল, আগের দিনের ১ দশ ৩ তার সুতা আছে। এখন হিসাব করে দেখা গেল, ৩ তারের সঙ্গে ৭ তার দিলে ১০ তার হবে। ৭ তার দিয়ে ১০ তার করে বেঁধে নেওয়ার পরে হয়তো ১ দশ ৪ তার সুতা হল। এইবার হিসাব হল, ১ দশ ৪ তার এবং আগের ৭ তার মিলে মোট কত তার হল।

এইভাবে সুতা কাটবার পরে ছেলেকে প্রতিদিন মুখে মুখে যোগ এবং বিয়োগের সাহায্যে সুতার সংখ্যা হিসাব করতে হয় এবং নিজের নিজের দিনলিপিতে লিখে রাখতে হয়। ছেলে যতদিন লিখতে না শেখে ততদিন শিক্ষক লিখে দেন। ক্রমে ছেলে লিখতে শিখে গেলে নিজেই লিখে রাখে। দিনলিপিতে তারিখ লিখতে হয়। প্রতিদিনের কাজ আগের দিনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে,

কোন্ দিন কত তার বেশি বা কম হল। প্রথম কিছুদিন নিজের সুতার হিসাবই ছেলে করে এবং লেখে। এই হিসাব আয়ত্ত হয়ে গেল ছেলেকে নিজের নিজের সারের মোট সুতা হিসাব করে দিনলিপিতে লিখে রাখতে বলা হয়। সব সারের মোট সুতার হিসাব হয়ে গেলে বিভিন্ন সারের তুলনা করা হয়। এইভাবে ছেলে লিখে যোগ এবং বিয়োগ অঙ্ক কষে।

সারের মোট সুতার হিসাব উপলক্ষে ছোট ছোট যোগ ছেলের আয়ত্ত হয়ে গেলে শ্রেণীর মোট সুতা হিসাব করে দিনলিপিতে লিখতে দেওয়া হয়, এবং প্রতিদিনের সারের ও শ্রেণীর মোট সুতার সঙ্গে আগের দিনের সুতার তুলনা করা হয়। এইভাবে সুতার অঙ্ক যত বাড়তে থাকে, যোগ বিয়োগের আকারও বাড়তে থাকে। এইসব হিসাবের মধ্য দিয়ে ছেলে ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত লিখতে শিখে যায়। তবে সব সংখ্যাগুলি ·লেখা সাধারণ বিদ্যালয়ের মত ১-এর পরে ২, ২-এর পরে ৩ এমনভাবে হয় না। যেদিন যেমন হিসাব হল, সেদিন সেই সংখ্যা লিখে রাখল। যেমন, একদিন ৫ তার সুতা হয়েছে। সেদিন লিখতে শিখল ৫। আর একদিন ৩ তার সুতা হল। সেদিন লিখল ৩। এইভাবে লিখতে লিখতে শেষ পর্যন্ত সব সংখ্যাই লিখতে শিখে যায়।

অধিকাংশ সংখ্যা অনিয়মিতভাবে শিখলেও কিছু কিছু সংখ্যা একাদিক্রমেও লিখবার এবং পড়বার সুযোগ আছে। প্রত্যেক ছেলের নাটাই রাখবার জায়গা ঠিক করা আছে। নামের পাশে ক্রমিক নম্বর দিয়ে ছেলেদের নামের একটি তালিকা তৈয়ারি করে নাটাই রাখবার ফ্রেমের পাশে টাঙিয়ে দেওয়া হয়। ছেলের নামের নম্বর দুটি কাগজে লিখে একটি তার নাটাইয়ে

এবং আর একটি নাটাই রাখবার জায়গায় এঁটে দেওয়া হয়। ছেলে নামের তালিকা থেকে নিজের নামের নম্বর দেখে তার নাটাইটি নেয় এবং পরে আবার নাটাইয়ের নম্বর দেখে নাটাইটি যথাস্থানে রেখে দেয়। নিজের নম্বর দেখবার এবং নাটাই নেবার ও রাখবার সময় অন্য ছেলেদের নম্বরও তার চোখে পড়ে। এইভাবে একাদিক্রমে কিছু সংখ্যা সে পড়তেও শেখে।

তারিখ দেখার জন্য ছেলেদের দেয়াল-পঞ্জিকা ব্যবহার করতে হয়। সেই দেয়াল-পঞ্জিকা ছেলেরা নিজেরাই তৈয়ারি করে নেয়। প্রথম শ্রেণীর প্রথম দিকে শিক্ষক তৈয়ারি করে দেন। সেইটাই ছেলে ব্যবহার করে। ক্রমে ছেলেকে দিয়েই তা করিয়ে নেওয়া হয়। এইভাবে ১ থেকে ৩২ পর্যন্ত সংখ্যা ছেলে একাদিক্রমে লিখতে ও পড়তে শিখে যায়।

এইভাবে গোনা, সংখ্যা পড়া ও লেখা এবং যোগ বিয়োগ আয়ত্ত হয়ে গেলে, সুতা কাটার আর একটি প্রক্রিয়া ছেলেকে শেখানো হয়। সেটি হচ্ছে তুলা পেঁজা। পেঁজার পরে ছেলেকে ধুনতে দেওয়া হয়। পেঁজা এবং ধোনার আগে ছেলে তুলা ওজন করে নেয়। কাজের শেষে আবার ওজন করে কতটা নষ্ট হল তার হিসাব করে। প্রথম শ্রেণীতে পেঁজা বা ধোনা তুলার পরিমাণ একটু একটু করে বাড়াতে বাড়াতে ৷১ তোলা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। প্রথমে ছেলে কেবলমাত্র নিজের পেঁজা বা ধোনা মোট তুলার এবং নষ্টের পরিমাণ হিসাব করে ও তা লেখে। পরে ক্রমশ নিজের সারের এবং শ্রেণীর মোট পেঁজা এবং ধোনার হিসাব করে ও লেখে। এই ভাবে প্রথম শ্রেণীর ছেলে ৵ আনা

থেকে ৻১ তোলা পর্যন্ত লিখতে শেখে। ক্রমে মোট কাজের হিসাব করা উপলক্ষে ওজনের মিশ্র যোগ করতে শেখে। সেই প্রসঙ্গে ছটাকও এসে যায়।

গোনা, অমিশ্র যোগ বিয়োগ এবং ওজনের মিশ্র যোগ ছাড়া প্রয়োজনমত কিছু কিছু গুণের নামতাও ছেলে শেখে। যেমন, দশ দশ করে বেঁধে ষোল দশ হলে সুতা খুলে নেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে ছেলে ১০-এর নামতা শেখে।

তা ছাড়া, সুতা কাটার সময় আগে স্থির করা হয়, কতক্ষণ সুতা কাটা হবে এবং মাথা পিছু কটা করে পাঁজ দেওয়া হবে। হয়তো স্থির হল, ১৫ মিনিট সুতা কাটা হবে এবং ২টা করে পাঁজ দেওয়া হবে। সময়ের হিসাব করতে হলে ঘড়ি দেখতে শেখার প্রয়োজন। সেই প্রসঙ্গে ছেলেকে বলে দেওয়া হল, এক এক ঘরে ৫ মিনিট করে আছে। সব ঘরগুলিতে যে মোট ৬০ মিনিট আছে তাও হিসাব করা হল। এই উপলক্ষে ৫-এর নামতা মুখস্থ করিয়ে দেওয়া হল। পাঁজ বিলি করবার সময় মাথাপিছু ২ টা করে দেওয়া হলে মোট কতটা পাঁজ লাগবে তার হিসাব হয়। সেই হিসাব উপলক্ষে ২-এর নামতা শেখে। ক্রমে সুতা কাটার সময় ও পরিমাণ বাড়তে থাকে এবং সেই সঙ্গে পাঁজের সংখ্যাও বাড়ে। নামতাও বিভিন্ন ঘরের শেখে।

এক সারে ৪ জন করে ছেলে বসে। প্রথম প্রথম ছেলেরা ১, ২, ৩ করে ছেলের সংখ্যা গোনে। পরে সার হিসাবে গুনতে শেখে। যেমন, ১ সারে ৪, ২ সারে ৮। এইভাবে ৪-এর নামতা এসে যায়। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে উৎসব পালন করা হয়। সেই উপলক্ষে কিছু খাবারের ব্যবস্থা থাকে। খাবার বিলি করবার প্রসঙ্গে নামতা আসে।

সাফাই এবং সুতা কাটা ছাড়া অন্যান্য কাজকে অবলম্বন করেও কিছু গণিত ছেলে শেখে। ছেলেরা বাগান করে। এই উপলক্ষে ছেলে হাত হিসাবে জমি মাপে, ওজন করে করে বীজ বসায় এবং ফসল তুলে ওজন করে কত হল। প্রত্যেক মাসে ছেলেদের ওজন নেওয়া হয়। তার মধ্য দিয়ে সের সম্বন্ধে ছেলের ধারণা জন্মে। প্রত্যেক ছয় মাস অন্তর ছেলের উচ্চতা মাপা হয়। সেই উপলক্ষে ফুট ইঞ্চি সম্বন্ধে ছেলের জ্ঞান হয়।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম শ্রেণীর মত হিসাব করে। তবে এই শ্রেণীতে কাজ অপেক্ষাকৃত বেশি বলে হিসাবও অপেক্ষাকৃত বেশি। এই শ্রেণীতে ছেলেদের চরকা দেওয়া হয়। টাকুর চেয়ে চরকাতে সুতার উৎপাদন অনেক বেশি হয়। সুতরাং ছেলেকে অনেক বড় বড় যোগ বিয়োগ কষতে হয়। হাজার, এমন কি লক্ষ পর্যন্ত, ছেলে হিসাব করতে ও লিখতে শেখে।

এই শ্রেণী থেকে প্রত্যেক শ্রেণীতে সুতা কাটার প্রগতি কত হবে সেটা ঠিক করা আছে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ঘণ্টায় ২৪০ তার প্রগতি হওয়া প্রয়োজন। প্রত্যেকদিন সুতা কাটবার আগে কতটা সময় সুতা কাটতে হবে এবং ঐ সময়ে প্রগতি অনুসারে মোট কত সুতা হওয়া উচিত তার হিসাব হয়। এই হিসাব উপলক্ষে ছেলেকে গুণ শেখানো হয়। যেমন, স্থির হল, ১ ঘণ্টা সুতা কাটা হবে। ছেলে আছে ১৬ জন। এখন, ১ জন ২৪০ তার সুতা কাটলে ১৬ জন মোট কত সুতা কাটবে? হিসাব করা হল, ১৬ বার ২৪০-এ কত হয়? তখন ২৪০কে ১৬ দিয়ে গুণ করে মোট সুতার হিসাব হল। সুতা কাটা হয়ে গেলে যোগের সাহায্যে

মোট সুতার হিসাব করে পরিকল্পনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়। এই উপলক্ষেও ছেলেকে বড় বড় বিয়োগ অঙ্ক কষতে হয়। তা ছাড়া, নিজের এবং শ্রেণীর মোট সুতার পরিমাণের তুলনা প্রসঙ্গে বিয়োগ তো রোজই করতে হয়। এই শ্রেণীতে নিজের ও শ্রেণীর প্রতিদিনের পেঁজা ধোনার পরিমাণও পূর্বদিনের সঙ্গে তুলনা করতে হয়। সেই উপলক্ষে ছেলেকে ওজনের মিশ্র বিয়োগ করতে হয়। প্রতিদিন সুতা কাটার মত পেঁজা ধোনার পরিকল্পনা করতে হয়। সেই উপলক্ষে ছেলে ওজনের ছোট ছোট মিশ্র গুণ শেখে।

দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে প্রত্যেক ছেলেকে সপ্তাহের এবং মাসের শেষে নিজের এবং শ্রেণীর পেঁজা ধোনা ও কাটার হিসাব করে সাপ্তাহিক ও মাসিক বিবরণ তৈয়ারি করতে হয়। এই সময়ে ছেলে সাপ্তাহিক ও মাসিক কাজের মোট মজুরির হিসাব করে। এখানেই টাকা আনার হিসাবের সঙ্গে ছেলের প্রথম পরিচয় হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছেলে অমিশ্র এবং মিশ্র যোগ বিয়োগ ও গুণ শেখে।

কাজের পরিমাণের হিসাব প্রত্যেক শ্রেণীতেই করতে হয়। কাজেই ওজন ও উচ্চতার মাপও সব শ্রেণীতেই নেওয়া হয়। কাজেই হিসাবও প্রায় একরকম হয়। তফাত শুধু অঙ্কের আকৃতিতে।

তৃতীয় শ্রেণী থেকে কাজের পরিমাণ ছাড়াও অনেকরকম হিসাব এসে পড়ে এবং গণিতও ছেলেকে খানিকটা বেশি শিখতে হয়। এই শ্রেণীতে ছেলেকে প্রতি দিন প্রতি সপ্তাহে ও প্রতি মাসে শ্রেণীর মোট উৎপাদনের হিসাব ছাড়াও গড় উৎপাদনের হিসাব করতে হয়। সেই উপলক্ষে ছেলে ভাগ শেখে। দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত ছেলে সুতার হিসাব তারের সংখ্যা ধরেই করে।

এই শ্রেণী থেকে তারকে গজে পরিণত করে হিসাব করা হয়। এই শ্রেণীতে ছেলেরা গুণ্ডির হিসাবও করে। ৬৪০ তার বা ৮৫৪ গজে ১ গুণ্ডি হয়। মজুরির হিসাব করবার সময় সুতার নম্বর হিসাব করতে হয়। নম্বর অনুযায়ী মজুরির ইতরবিশেষ হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর সুতার নম্বর উপরের শ্রেণীর ছেলেরা হিসাব করে দেয়। তৃতীয় শ্রেণী থেকে ছেলেরা নিজেরাই হিসাব করে। এই সমস্ত হিসাব উপলক্ষে ছেলেরা লঘূকরণ ও বড় বড় ভাগ অঙ্ক কষে।

ছাত্র-প্রতি সাপ্তাহিক এবং মাসিক গড় মজুরি হিসাব করবার সময় গড় উপস্থিতি হিসাব করে নিতে হয়। এই উপলক্ষে ছেলে দশমিক ভগ্নাংশ শেখে।

বিদ্যালয়ে ছেলেদের কাগজ পেন্‌সিল ইত্যাদি শিক্ষার সরঞ্জামের একটি দোকান আছে। দোকানের ক্রয় বিক্রয়ের কাজ এবং লাভ লোকসানের হিসাব ছেলেরাই করে। এই উপলক্ষে ছেলেকে টাকা আনার সবরকম হিসাবই করতে হয়। সে ঐকিক নিয়মও শেখে। এই শ্রেণী থেকে ছেলেরা উৎসবের জমাখরচের হিসাব রাখে। এইভাবে এই শ্রেণীর ছেলেরা অমিশ্র এবং টাকা আনা ও গজ ফুটের মিশ্র চার নিয়ম, লঘূকরণ ও দশমিকের অঙ্ক শেখে। উৎসবের জিনিসের দাম হিসাব করা উপলক্ষে শুভঙ্করী সম্বন্ধে ছেলের খানিকটা ধারণা হয়।

চতুর্থ শ্রেণীতে ছেলে তৃতীয় শ্রেণীর মত হিসাবই করে। তা ছাড়া আরও খানিকটা বেশি গণিত এই শ্রেণীর ছেলেদের শিখতে হয়। এই শ্রেণীতে ছেলেরা প্রথম সুতার শক্তি হিসাব করে। চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্রেণীর ছেলেরাই বিদ্যালয়ের অন্যান্য শ্রেণীর সুতার শক্তি হিসাব করে দেয়। সুতার শক্তি হিসাব

করা উপলক্ষে ছেলেকে সামান্য ভগ্নাংশ শিখতে হয়। ভগ্নাংশের ছোট বড় হিসাব করবার প্রয়োজনে ল. সা. গু. শিখতে হয়।

বিদ্যালয়ে ছেলেদের তৈয়ারি পাঁজ এবং ছেলেদের সুতায় বোনা কাপড়ের দোকান আছে। খরচ ইত্যাদি সহ পড়তা মূল্য হিসাব করা উপলক্ষে ছেলে সাঙ্কেতিক অঙ্ক শেখে, এবং শুভঙ্করী সম্বন্ধে তার আর একটু বেশি জ্ঞান হয়।

এই শ্রেণী থেকে ছেলে প্রতিদিন দিনরাতের হ্রাস বৃদ্ধি হিসাব করে। এই উপলক্ষে সে ঘণ্টা মিনিটের অঙ্ক শেখে।

কাজের হিসাব পঞ্চম শ্রেণীর ছেলেদের চতুর্থ শ্রেণীরই মত। দোকান ইত্যাদির কাজে এই শ্রেণীর ছেলেরা অন্য শ্রেণীর ছেলেদের সাহায্য করে। এইসব কাজ ছাড়াও ছেলেরা অন্যান্য কাজ করে এবং সেইসব কাজ থেকে আয়ও কিছু কিছু হয়— যেমন পাপোষ তৈয়ারি, খাম তৈয়ারি, বোর্ড ফাইল তৈয়ারি, খাতা বাঁধানো। প্রত্যেকটি কাজের জন্যই আলাদা আলাদা তহবিল ও জমাখরচের হিসাব আছে। কাজের জন্য খরচ হয় নির্দিষ্ট তহবিল থেকে, আবার জমাও হয় সেই তহবিলেই। উৎসবেরও একটি তহবিল আছে। উৎসবের খরচ বাবদ কেউ কিছু দিলে সেই তহবিলেই জমা হয় এবং প্রয়োজন অনুসারে উৎসবের খরচও সেখান থেকেই করা হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর ছেলেদের দিয়েই বিভিন্ন কাজ করানো হয়। কিন্তু কাজ করাবার এবং হিসাব নিকাশের ভার থাকে পঞ্চম শ্রেণীরই উপরে।

তা ছাড়া, বাগানের কাজ করার সময়ে সমস্ত জমিকে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ভাগ করে দেবার ভার পঞ্চম শ্রেণীর উপরে থাকে। জমি মাপা এবং ভাগ করা উপলক্ষে ছেলে কিছু কিছু কাঠাকালি বিঘাকালির হিসাব শেখে। এ ছাড়া জমি মাপা উপলক্ষে ছেলের

জ্যামিতির বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে ধারণা হয়। জমি বিলি উপলক্ষে ছেলে গ. সা. গু. শেখে। বাগানের জমি মাপা ছাড়াও কোথায় কোন্ গাছ বসানো হবে, কোথায় পুকুর হবে ইত্যাদি স্থির করা উপলক্ষে বিদ্যালয়ের সীমা এবং ভিতরকার জমি মাপতে হয় ও নক্‌সা তৈয়ারি করতে হয়। এইসব উপলক্ষ করেও কাঠা বিঘা সম্বন্ধে ছেলের জ্ঞান হয়। নক্‌সা তৈয়ারি উপলক্ষে ছেলে স্কেল অনুযায়ী আঁকতে শেখে।

এইভাবে বিভিন্ন কাজকে অবলম্বন করে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ছেলেরা পাঁচ বছরে অমিশ্র ও মিশ্র চার নিয়ম, লঘূকরণ, সামান্য ও দশমিক ভগ্নাংশ, সাঙ্কেতিক, ঐকিক নিয়ম এবং ল. সা. গু., গ. সা. গু. শেখে। তা ছাড়া শুভঙ্করীর কাঠাকালি বিঘাকালি প্রভৃতির ও জ্যামিতির খানিকটা জ্ঞান লাভ করে। এখানে সমস্ত গণিতটা ব্যবহারিকভাবে শেখা হয় বলে ছেলে খুব সহজেই শেখে।

—বার—

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পাঠ-পরিকল্পনা

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট পাঠ্য-পুস্তক নাই। যখন যেমন প্রয়োজন তখন সেইরকম পড়ানো হয়। কোন্ দিন কোন্ বিষয়ের অবতারণা হবে এবং তাতে কত সময় লাগবে, তা আগে থেকে জানা সম্ভব নয়। তাই সাধারণ বিদ্যালয়ের মত এখানে কোন্‌দিন কোন্ বিষয়ে কতক্ষণ পড়ানো হবে তার একটা স্থায়ী সময়সূচী করে রাখা সম্ভব হয় না। এখানে একদিনের সময়সূচী তার আগের দিনে করে নিতে হয়। ছেলের প্রতিদিনকার কাজ এবং প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে যোগ রেখে এই সময়সূচী তৈয়ারি করা হয়। সব ক্ষেত্রে এই সময়সূচী হুবহু অনুসরণ করা সম্ভব হয় না। কখনও উপস্থিত ঘটনা এবং ছেলের ইচ্ছা অনিচ্ছা অনুসারে এই সময়সূচীর অল্প বিস্তর পরিবর্তন করতে হয়। তবু শিক্ষককে একটা সময়সূচী তৈয়ারি করে নিয়ে যেতে হয়।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কাজকে কেন্দ্র করে পড়ানো হয়। সেইজন্য কি কাজ হবে সেইটা প্রথমে স্থির করা হয়। তার পর সেই কাজের বিভিন্ন প্রক্রিয়া কি কি, কোন্ প্রক্রিয়াতে কতক্ষণ সময় লাগবে, সেই কাজ করতে গিয়ে নূতন কিছু জানার প্রয়োজন হলে সেটা জেনে নিতে বা পড়ে নিতে কত সময় লাগবে, এইসব হিসাব করে সময়সূচী তৈয়ার করা হয়। এই সময়সূচী অনুযায়ী

কাজ কেমন করে করাবেন, কোন্ কাজের প্রসঙ্গে কি আলোচনা করবেন বা পড়াবেন শিক্ষককে তার একটা পরিকল্পনাও করে নিতে হয়। প্রথম শ্রেণীর শিক্ষকের একদিনের সময়সূচী ও পরিকল্পনার একটি নমুনা এইখানে দেওয়া হল।

বিদ্যালয়ে কিভাবে কাজ হয়, তা না জানলে এই পরিকল্পনা ভাল বোঝা যাবে না। সেইজন্য পরিকল্পনার শেষে পরিকল্পনার অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে একটু করে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য দেওয়া হল। বলা বাহুল্য এগুলি পরিকল্পনার অঙ্গ নয়।

প্রথম শ্রেণী

১৫ জুলাই, সোমবার

মোট সময়—৪ ঘণ্টা
ব্যক্তিগত সাফাই—৩০ মিনিট
সুতা কাটা—৩০ মিনিট
সুতা গুটানো—১৫ মিনিট
দেয়াল-পঞ্জিকা তৈয়ারি—১ ঘণ্টা
আবৃত্তি—১৫ মিনিট
গান—৩০ মিনিট
হিসাব ও দিনলিপি—১ ঘণ্টা

ঘণ্টা বাজার ১৫ মিনিট আগে স্কুলে যাব। শ্রেণী-সাফাইয়ের কাজ দেখব। ময়লা ফেলার গর্তটা ভতি হয়ে গেছে। একটা নূতন গর্ত করতে হবে। (১)

গানের ঘণ্টা বাজলে ছেলেদের নিয়ে গানের জায়গায় যাব।

অণিমা কাল সার ভেঙ্গে ফেলেছিল। আজ যাতে সে সারের মধ্যে থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। (২)

শ্রেণীতে ফিরে এসে বার তারিখ ও আবহাওয়ার কথা আলোচনা করব এবং একজন ছেলেকে দিন-পঞ্জিকার ফ্রেমে বার তারিখের কার্ড এবং আর একজনকে আবহাওয়া-পঞ্জিকার ফ্রেমে আবহাওয়ার কার্ড সাজাতে বলব। (৩)

ছেলেমেয়েদের চুল দাঁত নখ ও জামা-কাপড় দেখব। যারা চুল আঁচড়ে আসবে না, তাদের নিজেদেরই আঁচড়াতে দেব। তার পর উপস্থিতির ফ্রেমে কার্ড সাজাতে দেব। (৪)

কাজের পরিকল্পনা বোর্ডে লিখে দেব। কাল নূতন মাস আরম্ভ হবে। আজ নূতন মাসের দেয়াল-পঞ্জিকা তৈয়ারি করতে হবে। সেইজন্য আজ তুলা ধোনার কাজ বন্ধ থাকবে। বৃষ্টির জন্য আজও বাগানের কাজ সম্ভব হবে না। (৫)

সুতা কাটা। সরঞ্জামের হিসাব করাব। নায়ককে সরঞ্জামের ফ্রেমে কার্ড সাজাতে এবং সরঞ্জাম বিলি করতে বলব। (৬)

সুতা গুটানো। সুতা গুটাবার সময় গীতা ও মানিক প্রায়ই গুনতে ভুল করে। তাদের গুটানোর দিকে একটু বিশেষ নজর রাখতে হবে। গুটাবার সময় সুতার হিসাব করাব এবং কার কত সুতা হল বোর্ডে লিখে রাখব। (৭)

মাসের শেষ শনিবারে বর্ষামঙ্গল উৎসব হবে। উৎসবে প্রথম শ্রেণী 'বাঙলা দেশে বর্ষা এসে লাগিয়ে দিল ধূম' এই কবিতাটি আবৃত্তি করবে এবং 'পথিক মেঘের দল জোটে ওই শ্রাবণ-গগন-অঙ্গনে' এই গানটি গাইবে বলে স্থির হয়েছে। (৮)

আবৃত্তি। কবিতাটি লিখে টাঙিয়ে দেব। প্রথমে সমবেতভাবে

এবং পরে আলাদা আলাদা করে কবিতাটি পড়াব। তারাপদ এবং প্রভাত 'স' উচ্চারণ করতে ভুল করে। তাদের উচ্চারণের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। (৯)

ভাত খেতে যাবার সময় ছেলেরা যাতে শ্রেণী থেকে সার বেঁধে বেরোয় এবং ভাত খেয়ে আসবার সময় যাতে পা ধুয়ে শ্রেণীতে ঢোকে সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। (১০)

দেয়াল-পঞ্জিকা তৈয়ারি। প্রথমে দেয়াল-পঞ্জিকায় ছবি দেগে রঙ দিতে দেব। ছেলেরা রঙ দিতে দিতে পঞ্জিকার কাগজে রুল কেটে দেব। লেখা হলে ছবি ও পঞ্জিকা আঠা দিয়ে আঁটবে এবং সুতা লাগাবে। পঞ্জিকা তৈয়ারি হয়ে গেলে কারটা ভাল হয়েছে, সেই নিয়ে আলোচনা করব। ভালটি শ্রেণীতে টাঙানো হবে। (১১)

গান। গানটি লিখে টাঙিয়ে দেব। গানটি গেয়ে শোনাব এবং পরে সমবেতভাবে সকলকে গান করাব। রেখা ও ঝরণাকে আলাদা করে গাওয়াব। (১২)

দিনলিপি। দিনচর্যা বলাব এবং দিনলিপি লেখাব। লেখার সময় ঘুরে ঘুরে দেখতে হবে এবং যাতে না মুছে লিখতে পারে, সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অজিতের লেখা এখনও ঠিক হয় নাই। তাকে ধরে ধরে লেখাতে হবে। (১৩)

ছুটির পর শ্রেণী সাফাই করাব। দরজা জানালা বন্ধ করা হলে পরীক্ষা করে দেখব। ১৫ মিনিটের মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে।

---

(১) স্কুল বসার ১৫ মিনিট আগে কয়েকজন ছেলে এসে শ্রেণী পরিষ্কার ও শ্রেণী সাজানোর কাজ করে। ছুটির পরও তারা ১৫ মিনিট থাকে এবং যাবার আগে আবার শ্রেণী পরিষ্কার

করে জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে যায়। সপ্তাহের কোন্ দিন কোন্ ছেলে আসবে, তা আগের সপ্তাহের শেষ দিনে ছেলেদের সভায় স্থির করে লিখে রাখা হয়।

(২) প্রতিদিন কাজের ঘণ্টার ৫ মিনিট আগে গানের ঘণ্টা পড়ে। সেই সময়ে একত্র সমবেত সঙ্গীত হয়। স্কুলের উঠানে সকল ছেলে মিলে একটা গান করে। তার পর সকলে নিজের নিজের শ্রেণীতে ফিরে গিয়ে শ্রেণীর কাজ আরম্ভ করে।

(৩) প্রতিদিন কাজ আরম্ভ করার পূর্বে বার, তারিখ ও দিনের আবহাওয়া সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। এইভাবে তারা বারের নাম, মাসের নাম প্রভৃতি শেখে।

শ্রেণীতে একটি দিন-পঞ্জিকার ফ্রেম আছে। তাতে মাস, বার ও তারিখ লেখা কার্ড বসিয়ে দেওয়া হয়। আর একটি আবহাওয়া-পঞ্জিকার ফ্রেম আছে। তাতে বারের নাম এবং 'রোদ' 'বৃষ্টি' 'মেঘ' 'বাতাস' এই চারটি আবহাওয়াজ্ঞাপক কথার মধ্যে একটি বসানো হয়। এক-এক দিন এক-একটি ছেলেকে এই ফ্রেমে কার্ড বসাতে দেওয়া হয়। তার ফলে আস্তে আস্তে ছেলেদের বার মাস, সাত বার, ১ থেকে ৩২ পর্যন্ত সংখ্যা এবং আবহাওয়াজ্ঞাপক কথা চারটির সঙ্গে পরিচয় হয়ে যায়।

(৪) প্রতিদিন ছেলেদের দাঁত নখ ইত্যাদি পরীক্ষা করে দেখা হয়। যে দাঁত মাজেনি তাকে দাঁত মাজতে বলা, যার নখ বড় হয়েছে তার নখ কেটে দেওয়া এবং যে স্নান করেনি তাকে সম্ভব হলে স্নান করিয়ে দেওয়া হয়। কাপড়-জামা পরিষ্কার আছে কিনা দেখা হয়।

ছেলেদের মধ্যে কতজন এসেছে, কতজন আসে নাই, কতজন দাঁত মেজেছে, কতজন মাজে নাই, কতজন স্নান করেছে, কতজন করে নাই, তা ছেলেদের দিয়ে হিসাব করানো হয়। একটি ফ্রেমে 'এসেছে', 'আসে নাই', 'দাঁত মেজেছে', 'দাঁত মাজে নাই', 'স্নান করেছে', 'স্নান করে নাই' এই কথাগুলির পাশে উপস্থিতি প্রভৃতির সংখ্যা বসিয়ে দেওয়া হয়। এক-একটি ছেলেকে এক-একটি সংখ্যা বসাতে দেওয়া হয়।

(৫) অন্যান্য শ্রেণীর পরিকল্পনা আগের দিন শিক্ষক ও ছাত্র একসঙ্গে বসে করা হয়। শ্রেণীর নায়ক সেই পরিকল্পনা বোর্ডে লিখে রেখে যায়। প্রথম শ্রেণীর পরিকল্পনা শিক্ষক নিজেই করেন।

(৬) একটা কাজের জন্য কি কি সরঞ্জাম কত লাগবে ছেলেদের দিয়ে তার হিসাব করানো হয়। পরে নায়ক সরঞ্জামের ফ্রেমে সরঞ্জামের নাম ও সংখ্যা লেখা কার্ড সাজিয়ে রাখে এবং ফ্রেম দেখে সরঞ্জাম বিলি করে। এর ফলে ছেলেরা সরঞ্জামের লিখিত নামের সঙ্গে পরিচিত হয়। কাজের দিক থেকেও সুবিধা হয়। লেখা থাকলে সরঞ্জাম হারাবার ভয় থাকে না।

(৭) সুতা গুটাবার সময় ছেলেরা দশ দশ করে গোনে এবং দশ তার করে বাঁধে। এই উপলক্ষে গুনতে এবং যোগ বিয়োগের হিসাব করতে শেখা হয়। সুতা কাটবার পর ছেঁড়া সুতা আবার ওজন করা হয়। এতে কতখানি তুলা নষ্ট হল বুঝতে পারা যায়। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে সাবধান হওয়া যায়। খানিকটা হিসাবও এই প্রসঙ্গে হয়।

(৮) বুনিয়াদী বিত্তালয়ে প্রায় প্রতিমাসেই এক-একটি উৎসব হয়ে থাকে। এই উৎসবে ছেলেরা আবৃত্তি গান অভিনয় ইত্যাদি করে। উৎসবের জায়গা সাজায়, আলপনা দেয়, ছবি আঁকে। এই উপলক্ষে আনন্দের মধ্য দিয়ে তাদের অনেক কিছু শেখা হয়।

(৯) বুনিয়াদী বিত্তালয়ে সব কিছু উপলক্ষ করেই ছেলেকে স্পষ্ট করে উচ্চারণ করতে এবং খানিকটা পড়তে শেখানো হয়। যখন যেটা আবৃত্তি করে, সেটা লিখে দেওয়া হয়। ছেলেরা পড়ে এবং পারলে নিজেদের খাতায় লিখেও নেয়।

(১০) গ্রামের ছেলেরা অনেকেই সকালে ভাত খেয়ে স্কুলে আসতে পারে না। সেইজন্য মাঝখানে এক ঘণ্টা ভাত খাবার ছুটি দেওয়া হয়। যারা খেয়ে এসেছে তারা বাড়ি থেকে মুড়ি নিয়ে আসে, এই সময়ে খায়।

(১১) ছেলেদের যথাসম্ভব নিজের প্রয়োজনীয় জিনিস তৈয়ারি করে নিতে উৎসাহ দেওয়া হয়। তারা প্রত্যেক মাসের পঞ্জিকা তৈয়ারি করে। প্রথম শ্রেণীতে বাঙলা মাসই শেখানো হয়। কাল বাঙলা মাসের পয়লা সেইজন্য আজ পঞ্জিকা তৈয়ারি করাতে হবে। পঞ্জিকার উপরে একটা ছবি থাকে। এরা এখনও আঁকতে শেখেনি। সেজন্য ছবির প্রান্তরেখা ছেপে দেওয়া হয়। এরা রঙ দিয়ে ভর্তি করে। এই উপলক্ষে ছেলের ছবি আঁকা শেখা হয়। সে ভাল করে সাজিয়ে লিখতেও শেখে।

(১২) শ্রেণীতে যখন যে গান গাওয়া হবে, তখন সেইটি লিখে টাঙিয়ে দেওয়া হয়। ছেলেদের সেটি পড়তে এবং লিখে

নিতে উৎসাহিত করা হয়। ছেলেরা পড়ে মুখস্থ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে গাইতে শেখে।

(১৩) দিনের শেষে ছেলেরা সারাদিন কি কি করল, তা তাদের দিনলিপিতে লিখে রাখে। আগে মুখে বলে। সেই উপলক্ষে গুছিয়ে বলার অভ্যাস হয়। বলা হলে লেখে। প্রথম শ্রেণীতে প্রথমে শ্লেটে লেখে। শিক্ষক দেখে দিলে সেইটি নিজের খাতায় তুলে নেয়। এই উপলক্ষে লেখার অভ্যাস হয়। তা ছাড়া দিনলিপি লেখার ফলে ছেলেরা হিসাব করে কাজ করতে অভ্যস্ত হয়।

—তের—

দিনলিপি

প্রতিদিনকার কাজ ও অভিজ্ঞতার কথা লিখে রাখা জীবনকে উন্নত করার একটি সুন্দর উপায়, এ বিষয়ে সকলেই একমত। দিনের শেষে দিনলিপি লিখতে গিয়ে সারাদিনের কতটা সময়ের সদ্ব্যবহার হল আর কতটার হল না, কোন্ কাজটা ভাল করে করা হয়েছে আর কোন্‌টা হয়নি, তা নিজের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। ফলে দিনের পর দিন মানুষ, সময়ের উপযুক্ত ব্যবহার কেমন করে করা যায়, নিজের সমস্ত কাজ কি করে ভালভাবে করা যায়, সেই বিষয়ে সচেষ্ট হয়। প্রতিদিন চেষ্টার ফলে সে এমন অবস্থায় এসে যায় যখন তার একটি মুহূর্ত সে অযথা নষ্ট হতে দেয় না এবং তার প্রত্যেকটি কাজ সে ভালভাবে করতে পারে। এইভাবে তার কার্যক্ষমতাই যে শুধু বেড়ে যায় তাই নয়, তার চিন্তাধারাও উচ্চ থেকে উচ্চতর লক্ষ্যের দিকে প্রবাহিত হয়।

মানুষের ভবিষ্যৎ জীবন অনেকখানি নির্ভর করে তার ছাত্র-জীবনের উপরে। ছাত্রজীবনের উদ্দেশ্য হল ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুতি। তাই ছাত্রাবস্থাতেই জীবনকে খুঁটিয়ে দেখার অভ্যাস করা প্রয়োজন। এই দিক থেকে বিদ্যালয়ে ছেলেদের দিনলিপি লেখা তাদের শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ হওয়া উচিত।

বুনিয়াদী বিদ্যালয় সম্বন্ধে এ কথা আরও বেশি করে খাটে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ছেলেকে শিক্ষা দেওয়া হয় কাজকে কেন্দ্র করে। বুনিয়াদী শিক্ষার মাধ্যম হল কোন না কোন শিল্প। ছেলেকে

তার প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে বৈজ্ঞানিক রীতিতে এই শিল্প অভ্যাস করতে হয়। এইভাবে কাজের মধ্য দিয়ে ছেলের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা জেগে ওঠে এবং সে ভবিষ্যৎ সমাজের সক্ষম ও স্বাবলম্বী সভ্যরূপে পরিণত হয়। এইভাবে ছেলেকে তৈয়ারি করাই এই শিক্ষার উদ্দেশ্য। এই শিক্ষায় প্রতিটি মূহূর্তের এবং প্রতিটি অভিজ্ঞতার মূল্য আছে। সমস্ত মূহূর্তগুলির অভিজ্ঞতা একসূত্রে বাঁধা। পূর্বলব্ধ অভিজ্ঞতার উপরে ভবিষ্যতের কর্মকুশলতা নির্ভর করে। তাই প্রত্যেকটি মূহূর্তের হিসাব এবং প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতার বিবরণ লিখে রাখা খুবই দরকার। তা হলে ছেলে প্রতিদিন তার কাজের প্রগতি মিলিয়ে দেখতে পারে এবং ক্রমশ উন্নতির দিকে এগিয়ে যেতে সচেষ্ট হয়। এইভাবে কাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ছেলের মানসিক বিকাশেরও সহায়তা হয়।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ছাপানো পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা নাই। দিনলিপির ভিতর দিয়েই ছেলের পড়া হয়। প্রতিদিন নিজের কৃত কাজের এবং লব্ধ অভিজ্ঞতার কথা লেখার ফলে ছেলের আত্মপ্রকাশের ক্ষমতার উন্মেষ হতে থাকে। দিনলিপি লেখার সময় তো পড়তেই হয়। শিক্ষককে শোনানোর সময়েও আবার পড়তে হয়। তা ছাড়া, আগেকার কাজের অথবা অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরের কাজ বা অভিজ্ঞতা মিলিয়ে দেখার সময় আগেকার দিনলিপি পড়তে হয়। সপ্তাহের কাজ হিসাব করার সময়ে সাত দিনের দিনলিপি এবং মাসের কাজ হিসাব করার সময়ে এক মাসের দিনলিপি পড়তে হয়। দৈনিক কাজ এবং কার্যলব্ধ অভিজ্ঞতার বিবরণ ছাড়াও প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশের সম্বন্ধে লব্ধ জ্ঞানও ছেলেকে দিনলিপিতে

লিখে রাখতে হয় এবং পড়তে হয়। এইভাবে ছেলের পড়ার অভ্যাস হয় এবং লেখার ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশের ক্ষমতাও বাড়ে।

দিনলিপি লেখা বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ। কিন্তু দিনলিপিতে কি লেখা হবে এবং কিভাবে লেখা হবে? দিনলিপি লেখা ভাষাজ্ঞানের উন্নতিসাধন করে এবং ছেলের আত্মপ্রকাশেরও ক্ষমতা বাড়ায়, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু বুনিয়াদী বিদ্যালয় তো কেবলমাত্র পড়া ও লেখার বিদ্যালয় নয়। এখানে কাজই করতে হয় বেশি। সমস্ত দিনই বা দিনের বেশির ভাগ সময়ই যদি লেখা এবং পড়ার উপরে জোর দেওয়া হয় তা হলে কাজ করানো যায় না। মানুষের জীবন এক ও অখণ্ড এবং কাজই হল তার ভিত্তি। সাধারণত বিদ্যালয়ের জীবনকে সমাজ-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা হয়। বিদ্যালয়ের জীবনে ছেলে কেবল লেখাপড়া করবে এবং তার পর কাজ করবে সমাজ-জীবনে প্রবেশ করে, এই হল আমাদের প্রচলিত ধারণা। বুনিয়াদী শিক্ষা এ ধারণার বিরোধী। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যই হল, ছেলে যে সমাজেরই একটি অঙ্গ এবং বিদ্যালয়ের জীবন যে সমাজ-জীবনেরই একটা অংশ, এই বোধ ছেলের মধ্যে জাগিয়ে দেওয়া। এ বোধ তো বই পড়ার ভিতর দিয়ে আসতে পারে না। সামাজিক জীবনের উপযোগী কাজের মধ্য দিয়েই এ বোধ জাগে, এবং সমাজের সঙ্গে ছেলেদের একটা নিবিড় যোগ স্থাপিত হয়। তাই বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কাজই বেশি করানো হয়। কাজ করতে করতে, কেন কাজ করছে, কেমন করে কাজ করবে এবং কিভাবে কাজ ঠিক হল কি হল না বুঝবে, এই সব দেখতে গিয়ে প্রত্যেকটি কাজকে কেন্দ্র করে কিছু না কিছু শিক্ষা ছেলেরা পায়। কাজেই

দিনলিপি লেখাতেই বেশির ভাগ সময় কাটিয়ে দিলে চলবে না। সময়ের বেশির ভাগই যদি দিনলিপি লেখায় কেটে যায়, তা হলে দিনলিপিতে লেখার জিনিসই তো থাকবে না। দিনলিপিতে কেবলমাত্র দিনের কাজের হিসাব এবং দৈনিক অভিজ্ঞতার বিবরণ এইটুকুই ছেলেরা লিখবে। দিনলিপি হবে ছেলের কাজের এবং তার ব্যক্তিত্বের ক্রমিক বিকাশের একটা প্রতিচ্ছবি।

এখন প্রশ্ন হল, দিনলিপি কখন লেখাতে হবে এবং কি প্রণালীতে লেখাতে হবে? ছেলেরা যখন প্রথম বিদ্যালয়ে আসে তখন তারা লিখতে পড়তে জানে না, এমন কি সব কথা স্পষ্ট এবং শুদ্ধ করে উচ্চারণও করতে পারে না। কাজেই এই সময়ে দিনলিপি লেখার প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর। এই সময়ে শিক্ষকের প্রথম কর্তব্য হবে তাদের উচ্চারণ পরিষ্কার করা এবং সচরাচর ব্যবহৃত কথাগুলিকে শুদ্ধ করে বলতে শেখানো। সেইজন্য এই সময়ে দিনলিপি না লিখিয়ে দিনচর্যা বলানো প্রয়োজন। ছেলে দিনের শেষে দিনের কাজের কথা এবং কাজ উপলক্ষে শিক্ষার কথা বলবে। এতে কথা বলার শিক্ষাও হবে, এবং কাজের হিসাব রাখা যে প্রয়োজন সে বোধও জাগবে। প্রত্যেক ছেলে আলাদা আলাদা করে বলবে। বলা হয়ে গেলে সকলের দিনচর্যার সারাংশ গ্রহণ করে শিক্ষক বোর্ডে যথাসম্ভব ছেলেদেরই ভাষায় সংক্ষেপে তা লিখে দেবেন এবং ছেলেদের দিয়ে সেই লেখা পড়িয়ে নেবেন। এইভাবে পড়তে পড়তে ছেলের ক্রমে লেখার ইচ্ছা হবে। তখন আস্তে আস্তে একটু একটু করে তাকে লেখা ধরাতে হবে। বৎসরের শেষভাগে ছেলে যেন দুই-তিনটি সম্পূর্ণ বাক্য লিখতে পারে এই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

প্রণালীটা হবে এই। প্রথমে ছেলেরা দিনচর্যা বলবে। প্রথম প্রথম গুছিয়ে বলতে পারবে না। কেমন করে বলতে হবে শিক্ষক শিখিয়ে দেবেন। বলার পরে নিজেরা সেইটি শ্লেটে লিখবে। অপরিচিত কথাগুলি শিক্ষক বোর্ডে লিখে দেখিয়ে দেবেন। লেখা হয়ে গেলে সেই লেখা পড়ে শোনাবে। পড়বার সময় লেখার ভুল নিজেরাই ধরতে পারবে। যেখানে পারবে না শিক্ষক দেখিয়ে দেবেন। এইভাবে সংশোধন করা হলে সেই সংশোধিত লেখা দিনলিপির খাতায় লিখে আর একবার পড়বে। ভুল থাকলে শিক্ষক আবার সংশোধন করে দেবেন। ছেলেরা এখনও লিখতে শেখেনি। কাজেই শিক্ষককে অক্ষরের গঠন এবং লেখার সৌন্দর্যের দিকেও বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। এইভাবে চলতে চলতে ক্রমশ অভ্যাস হয়ে গেলে বলার প্রয়োজন আর থাকবে না। তখন ছেলে একেবারেই লিখবে। কিছুদিন পরে শ্লেটে লেখার প্রয়োজনও আর হবে না। এমনি করেই লিখতে লিখতে ক্রমশ তার লেখার পরিমাণ বাড়তে থাকবে। লেখার পরিমাণ যাতে আস্তে আস্তে বাড়ে শিক্ষকও সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। প্রথম প্রথম একই খাতায় সংক্ষেপে সব লেখা হবে। পরে যেমন লেখার পরিমাণ বাড়বে, অমনি বিভিন্ন খাতায় বিভিন্ন বিষয়ে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে লেখাতে হবে। এই খাতাগুলিই হবে ছেলেদের বই। সাধারণ বিদ্যালয়ে ছেলেরা তৈয়ারি বই কিনে পড়ে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে তারা নিজেদের বই নিজেরাই তৈয়ারি করবে।*

---

* পণ্ডিত রামশরণ উপাধ্যায়ের হিন্দী প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত।

—চৌদ্দ—

বুনিয়াদী শিক্ষা ও উৎসব

মানুষের জীবনে যেমন কাজ আছে তেমনই উৎসবও আছে। উৎসব মানুষকে তার প্রতিদিনের গতানুগতিক জীবন থেকে মুক্তি দেয়, তার জীবনে বৈচিত্র্য নিয়ে আসে। উৎসবের ভিতর দিয়ে মানুষ একটা নূতনত্বের আস্বাদ পায়।

এমন মানুষ আছে যারা তাদের প্রতিদিনকার কাজের মধ্যেই যথেষ্ট আনন্দ পায়। তাদের কাজই তাদের মনটাকে ভরিয়ে রাখে। কিন্তু সাধারণত এটা হয় না। অবশ্য আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে একটা আনন্দ আছে। তা না হলে দিনের পর দিন এই জীবন বহন করে চলতে আমরা পারতাম না। কিন্তু শুধু তাতেই আমাদের মনটা খুশি হয় না। তাই মাঝে মাঝে সেই কাজের থেকে আমরা ছুটি নিতে চাই, কিছুক্ষণের জন্য কাজকে সরিয়ে রেখে উৎসবের আয়োজন করি।

উৎসব উপলক্ষে আমাদের পরিশ্রম কিছুমাত্র কম হয় না। বরং প্রতিদিনকার কাজে যে পরিশ্রম করতে হয়, উৎসব করতে গিয়ে পরিশ্রম করতে হয় তার চেয়ে অনেক বেশি। তবু সেটা গায়ে লাগে না। তার কারণ উৎসব আমরা দায়ে পড়ে করি না, উৎসব করি নিছক আনন্দের প্রেরণায়। উৎসবের মধ্যে আমাদের মনটা তার প্রয়োজনের দায় থেকে মুক্তি পেয়ে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

মানুষ সামাজিক জীব। সে মানুষের সঙ্গ চায়। শুধু যে কাজের প্রয়োজনেই মানুষ মানুষের সঙ্গ খোঁজে তা নয়। এটা

তার অন্তরের প্রয়োজনও বটে। পাঁচজনের সঙ্গে মিশে, পাঁচজনের সঙ্গে আপনাকে মিলিয়ে দিয়ে সে যেন নিজেকে আরও ভাল করে পায়। মানুষের সঙ্গে মিলতে মানুষকে প্রতিদিনই হয়। তবু সে মেলার মধ্যে একটা বাধা থাকে। উৎসবের মধ্যে এই বাধা দূর হয়ে যায়। মানুষ কোথাও কোন কার্পণ্য না রেখে পরিপূর্ণভাবে নিজেকে সকলের মাঝখানে ছেড়ে দেয়।

এইসকল কারণে মানুষের সমাজে উৎসবের সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ বার মাসে তের পার্বণের ব্যবস্থা করেছে।

যে কারণে বাহিরের সমাজ-জীবনে উৎসবের প্রয়োজন, ঠিক সেই কারণেই বিদ্যালয়ের সমাজ-জীবনেও উৎসবের প্রয়োজন। তা ছাড়া, বাহিরের সমাজ-জীবনের জন্য ছেলেকে তৈয়ারি করাই বিদ্যালয়ের কাজ। উৎসব যখন সমাজ-জীবনের একটা প্রয়োজনীয় অঙ্গ, তখন বিদ্যালয়ে ছেলেকে যে কেবল কাজের জন্যই তৈয়ারি করতে হবে তা নয়, উৎসবের জন্যও তৈয়ারি করতে হবে। ছেলে শুধু কাজের লোক হলেই চলবে না, তাকে সামাজিকও হতে হবে। তা করতে গেলে বিদ্যালয়েও উৎসবের ব্যবস্থা করতে হয়।

সাধারণ বিদ্যালয়ে এই দিকটায় তেমন নজর দেওয়া হয় না। সেখানে সমগ্র বিদ্যালয়-জীবনে দুটি মাত্র উৎসবের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এক সরস্বতী পূজা এবং আর এক পারিতোষিক বিতরণ। তার মধ্যেও পারিতোষিক বিতরণ সব জায়গায় হয় না। যেখানে হয় সেখানেও সব ছেলের তার সঙ্গে যোগ থাকে না। তা ছাড়া, এই সংক্রান্ত ব্যবস্থা বন্দোবস্ত সব শিক্ষকেরাই করেন। ছেলেদের স্বতঃপ্রণোদিত কাজের অবসর সেখানে অত্যন্ত কম। সরস্বতী পূজাই বলতে গেলে একমাত্র উৎসব, যেটাকে ঠিক ছেলেদের উৎসব বলা যায়।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের লক্ষ্য, শুধু ছেলেকে লেখাপড়া শেখানো নয়, তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ। সেইজন্য সেখানে ছেলের জীবনের সকল দিকটার উপরেই নজর রাখতে হয়। কাজের কথা যেমন ভাবতে হয়, উৎসবের কথাও তেমনই ভাবতে হয়। এর একটা আনুষঙ্গিক লাভও আছে। বুনিয়াদী শিক্ষায় ছেলেকে তার জীবনের ভিতর দিয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। কাজকে অবলম্বন করে যেমন শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে, উৎসবকে অবলম্বন করেও তেমনই শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। বরং উৎসবকে উপলক্ষ করে এমন কতকগুলি শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে যা ঠিক কাজকে উপলক্ষ করে দেওয়া যায় না।

কাজের নিজেরই একটা শিক্ষা আছে। কাজ করতে গেলেই মানুষকে একটা বিশেষভাবে তার শরীর মন চালনা করতে হয়। তার ফলে একটা শিক্ষা লাভ হয়। সে শিক্ষার মূল্যও বড় কম নয়। তা ছাড়া, বিশেষভাবে শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে যেখানে কাজ হয় সেখানে তো আরও অনেক বেশি শিক্ষাই হয়ে থাকে। তবে, এই যে শিক্ষা, এটা নির্ভর করে কেমন করে কাজ করা হচ্ছে তার উপরে, কি কাজ করা হচ্ছে বা কতখানি কাজ করা হচ্ছে তার উপরে তত নয়। কাজ করতে গেলে প্রথমেই কি উদ্দেশ্যে কাজটা করা হচ্ছে তা ভাবতে হয়। তার পর স্থির করতে হয় কিভাবে কাজটা হবে। পরে একটির পর একটি সেই কাজের বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলির অনুষ্ঠান করতে হয়। সকলের শেষে দেখতে হয়, আমরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে যেভাবে কাজ করতে চেয়েছিলাম তা ঠিক হয়েছে কি না। কোথাও কোন ত্রুটি হয়ে থাকলে কি ত্রুটি হয়েছে এবং কেন হয়েছে তাও চিন্তা করতে

হয়। এইভাবে কাজ করতে পারলেই সেই কাজ থেকে যতটুকু শিক্ষা পাবার তা পাওয়া যায়। প্রকল্প (project)-পদ্ধতিতে এইভাবেই কাজ করানো হয়ে থাকে।

বুনিয়াদী শিক্ষায় প্রাত্যহিক শিল্পকর্মকে ইচ্ছা করলে এই প্রকল্পের রূপ দেওয়া যেতে পারে। তবে সেটা চেষ্টা করে করতে হয় এবং সব সময়ে সহজে করাও যায় না। কিন্তু উৎসবের নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান আপনা-আপনি এই প্রকল্পের রূপ গ্রহণ করে। কাজেই তা থেকে শিক্ষার সুযোগও বেশি পাওয়া যায়। তা ছাড়া, উৎসব উপলক্ষে বহু বিচিত্র রকমের কাজের প্রয়োজন হয়। উৎসবস্থল সাজানো এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় সজ্জাদ্রব্য তৈয়ারি, আলপনা দেওয়া ও ছবি আঁকা, আবৃত্তি গান ও অভিনয়, অভিভাবকদের নিমন্ত্রণ ও অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা, উৎসবের হিসাব রাখা ও বিবরণ প্রস্তুত, এসব তো আছেই। এ ছাড়াও, যদি উৎসবের দিনে খাবারের আয়োজন করা হয় তাহলে তার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনা ও খাবার তৈয়ারির কাজও হতে পারে।

বিদ্যালয়ে প্রধানত তিন রকমের উৎসব পালন করা যেতে পারে—ঋতু-উৎসব যেমন বর্ষামঙ্গল, জাতীয় উৎসব যেমন স্বাধীনতা-দিবস, এবং স্মরণোৎসব যেমন গান্ধী-জন্মদিবস। সমাজে উৎসবের মধ্যে ধর্মোৎসবেরও একটা বড় স্থান আছে। হিন্দুসমাজের অধিকাংশ উৎসবের সঙ্গেই বলতে গেলে কোন না কোন ভাবে ধর্ম জড়িত আছে। কিন্তু বিদ্যালয়ে এই ধর্মোৎসব চলবে না। বিদ্যালয়ে সকল ধর্মসম্প্রদায়ের ছেলেই থাকবে। কাজেই ধর্মোৎসব অনুষ্ঠানের অসুবিধা আছে। তবে কোন ধর্মোৎসব পালন করতে হলে তার

ধর্মের দিকটা বাদ দিয়ে কেবল উৎসবের দিকটা গ্রহণ করতে হবে।

উৎসব অনুষ্ঠানের সময় একটা বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। উৎসবগুলির মধ্যে যেন সত্যসত্যই উৎসবের ভাব থাকে। উৎসব যেন শুধু শিক্ষা দেবার একটা উপলক্ষমাত্র না হয়। উৎসবের প্রেরণা ছেলেদের নিজেদের মধ্যে থেকেই আসবে এবং উৎসবের ব্যবস্থাও তারা নিজেরাই করবে। এ বিষয়ে তাদের যতখানি স্বাধীনতা দেওয়া সম্ভব তা দিতে হবে। শিক্ষকের নির্দেশে তাঁরই ব্যবস্থা অনুসারে যদি উৎসব হয় তা হলে সে উৎসবের মধ্যে প্রাণ থাকবে না। ছেলেরা প্রাণ খুলে উৎসবে যোগ দিতে না পারিলে উৎসবের যে নৈতিক লাভ তাও পুরোপুরি পাওয়া যাবে না। বুনিয়াদী বিত্থালয়ে সব কাজেই শিক্ষক ছেলেদের সঙ্গে সহকর্মীর মত ব্যবহার করবেন। উৎসবের কাজে তো তাঁকে বিশেষ করেই এইভাবে ব্যবহার করতে হবে।

উৎসবগুলি যাতে একঘেয়ে হয়ে না যায় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। সেইজন্ত বিভিন্ন উৎসব বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে করতে পারলে ভাল হয়। কোনটা ঘরে, কোনটা বাইরে, কোনটা বা গাছের তলায় করা যেতে পারে। বিভিন্ন উৎসবের কার্যক্রমও যথাসম্ভব বিভিন্ন হবে। কোনটার কার্যক্রম হবে প্রধানত সাংস্কৃতিক, কোনটার সামাজিক, কোনটাতে বা কাজেরই প্রাধান্ত থাকবে। উৎসবের স্থায়িত্বও সবগুলির একরকম হবে না। কোন উৎসব সমস্ত দিন ধরে হবে, কোনটা অর্ধেক দিন। কোনটা বা এক ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে।

উৎসবের সংখ্যা বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। উৎসব বেশি হয়ে গেলে তাতে উৎসবের মাধুর্য থাকবে না। তা ছাড়া, উৎসবের

আধিক্যে কাজের ক্ষতি হতে পারে, বিদ্যালয়ের আবহাওয়াও একটু অতিরিক্ত হালকা হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। মাসে একটার বেশি উৎসব কোন রকমেই হওয়া উচিত নয়। যাতে দীর্ঘ দিনের প্রস্তুতির প্রয়োজন হবে এমন উৎসব বৎসরে চারটা হলেই যথেষ্ট হল।

মোটামুটি এই কয়েকটি উৎসব পালন করা যেতে পারে ঃ

ঋতু-উৎসব—নববর্ষ, বর্ষামঙ্গল, শারদোৎসব, নবান্ন, বসন্তোৎসব;

জাতীয় উৎসব—স্বাধীনতা-দিবস, প্রজাতন্ত্র-প্রতিষ্ঠা-দিবস;

স্মরণোৎসব—বুদ্ধ-জন্মদিবস, মহম্মদ-জন্মদিবস, খ্রীষ্ট-জন্মদিবস; চৈতন্য-জন্মদিবস, গান্ধী-জন্মদিবস, রবীন্দ্র-জন্মদিবস।

কখনও কখনও এর মধ্যে দুটো উৎসব একই মাসে এবং হয়তো কাছাকাছি পড়ে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে একটাকে বাদ দেওয়াই ভাল। কোন উৎসব গ্রীষ্মের অথবা পূজার ছুটির মধ্যে পড়লে সেটা স্বভাবতই বাদ যাবে।

—পনের—

বুনিয়াদী শিক্ষায় পরীক্ষা

বুনিয়াদী শিক্ষায় পরীক্ষা থাকবে কি না এবং থাকলে কিভাবে থাকবে, এই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এই প্রশ্নের মীমাংসা করতে হলে পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং প্রচলিত পরীক্ষাপদ্ধতির উপযোগিতা সম্বন্ধে আলোচনা করতে হয়।

পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই। আমরা যখন ছেলেকে শিক্ষা দিই তখন আমাদের সামনে একটা লক্ষ্য থাকে। আমরা চাই, শিক্ষার শেষে ছেলে সেই লক্ষ্যে পৌঁছবে। শিক্ষা সমাপ্তির পর ছেলে সেই লক্ষ্যে পৌঁছিল কিনা পরখ করে দেখার প্রয়োজন আছে। শুধু তাই নয়। নির্দিষ্ট সময়ে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে হলে একটা নির্দিষ্ট গতিতে চলতে হয়। ছেলে ঠিক সেইভাবে চলছে কি না তাও মাঝে মাঝে যাচাই করে দেখার দরকার হয়। তারই জন্য পরীক্ষার প্রয়োজন।

প্রচলিত পরীক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে আমাদের সকলেরই পরিচয় আছে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর পরীক্ষার দিন স্থির হয়। পরীক্ষার দিনে ছেলেকে কতকগুলি প্রশ্ন দেওয়া হয়। তাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তার উত্তর লিখে দিতে হয়। লিখিত উত্তর পরীক্ষক দেখেন। প্রশ্নগুলির জন্য একটি পূর্ণসংখ্যা নির্দিষ্ট থাকে। উত্তরের ভালমন্দ অনুসারে তাতে নম্বর দেওয়া হয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার মান স্বরূপ একটা ন্যূনতম নম্বর নির্দিষ্ট থাকে। সেই নম্বর পেলে ছেলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে বলে ধরা হয়।

এখন, ছেলের যোগ্যতা বিচারের দিক থেকে এই পরীক্ষার উপযোগিতা কতখানি সেই হল প্রশ্ন। ছেলে সারা বছর ধরে নিয়মিতভাবে পড়াশোনা করবে, এই আমরা চাই। কিন্তু এই পরীক্ষা থেকে ছেলে তা করেছে কিনা বোঝা যায় না। যে ছেলে এগার মাস কিছু করেনি সেও যদি শেষের একটা মাস একটু খেটে পড়ে তা হলে পরীক্ষায় পাশ হয়ে যাবে। তা ছাড়া, এই ধরণের পরীক্ষায় পাশ হবার জন্য সমস্ত পাঠ্য বিষয়টা আয়ত্ত করবার দরকার হয় না। এমন কি যা পড়ল তা বুঝে পড়বারও প্রয়োজন নাই। পরীক্ষায় কি ধরণের প্রশ্ন আসতে পারে তা বুদ্ধিমান ছেলেরা বোঝে। সেই অংশগুলি কোন রকমে মুখস্থ করে মুখস্থ করা কথাগুলি লিখে দিয়ে আসতে পারলেই হল।

তার পর উত্তরের মূল্য নির্ধারণের কথা। সেটাও এমনভাবেই হয়ে থাকে যে তার ভিতর দিয়ে সত্যকার ভালমন্দ বোঝা কঠিন হয়। প্রথমত পরীক্ষা পাশের জন্য সব প্রশ্নের উত্তর দেবার দরকার হয় না। তার উপর, ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নম্বর নির্দিষ্ট থাকে। একটি প্রশ্নের উত্তর অত্যন্ত নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক হলেও সেটির জন্য অন্য প্রশ্নের কিছু যাবে আসবে না। এই সম্বন্ধে কৌতুক করে এক জায়গায় বলা হয়েছে, ছেলেকে প্রশ্ন করা হল: গঙ্গার ধারের চারটি বড় সহরের নাম কর। ছেলে উত্তর করল: লণ্ডন, বার্লিন, বোম্বাই ও কলিকাতা। শতকরা ২৫ নম্বর পেলে পাশ। তিনটা উত্তর ভুল হলেও একটা ঠিক হয়েছে। সুতরাং ছেলে পাশ হয়ে গেল। কথাটা একটু কৌতুক করে বাড়িয়ে বলা হলেও ব্যাপারটা প্রায় এইরকমই দাঁড়ায়। সমস্ত উত্তরটা দেখে বিচার করলে

যেখানে এক নম্বরও পাওয়া উচিত নয়, সেখানে আলাদা আলাদা বিচার করা হয় বলে ছেলে অনায়াসে পাশের নম্বর পেয়ে যায়।

এ ছাড়াও আবার পরীক্ষকের তারতম্য আছে। একটা উত্তরের জন্য এক পরীক্ষক এক নম্বর দেবেন, আর এক পরীক্ষক আর এক নম্বর। এক প্রশ্নের একই উত্তরের জন্য বিভিন্ন পরীক্ষক ১০-এর মধ্যে ১ থেকে ৮ নম্বর দিয়েছেন, এমনও শোনা গেছে। শুধু তাই নয়। একই পরীক্ষক একটা উত্তরের জন্য এক সময়ে এক নম্বর দিলেন এবং আর এক সময়ে আর এক নম্বর দিলেন, এমনও দেখা যায়। ছেলে তার উত্তরের জন্য কত নম্বর পাবে সেটা যেমন পরীক্ষকের ব্যক্তিত্ব তেমনই তাঁর সাময়িক মানসিক অবস্থার উপরেও নির্ভর করে। এইসকল কারণে প্রচলিত পরীক্ষার ভিতর দিয়ে ছেলের যোগ্যতা বিচার যেভাবে হওয়া উচিত তা হয় না। সেইজন্য আজ চারিদিকেই প্রচলিত পরীক্ষাপদ্ধতির সংস্কারের কথা উঠেছে।

প্রচলিত পরীক্ষায় অল্প কয়েকটি প্রশ্ন থাকে। প্রশ্নের উত্তর একটি ছোটখাট প্রবন্ধের মত করে লিখতে হয়। তার পরিবর্তে অনেকগুলি প্রশ্ন দেওয়া হবে এবং এক-একটি প্রশ্নের উত্তর যথাসম্ভব অল্প কথায়—অনেক সময় এক কথাতেই—দেওয়া চলবে। কাজেই উত্তরের গুণাগুণ বিচারে পরীক্ষকের ব্যক্তিগত প্রভাব কাজ করার সুযোগ কম পাবে। প্রশ্নগুলি সংখ্যায় বেশি হবে, সুতরাং সমস্ত পাঠ্য বিষয়টির উপরেই প্রশ্ন থাকবে। তা ছাড়া, প্রশ্নগুলি এমন হবে যাতে ছেলের মুখস্থ বিদ্যার চেয়ে সাধারণ জ্ঞানেরই পরিচয় বেশি পাওয়া যায়। এই নূতন পদ্ধতির

পরীক্ষায় প্রচলিত পরীক্ষার কতকগুলি ত্রুটি সংশোধিত হবে, এটা ঠিক। কিন্তু তা হলেও সাময়িক পরীক্ষার যে অসুবিধা তা খানিকটা থেকেই যাবে।

এ তো গেল ছেলের যোগ্যতা পরিমাপের দিক। এ ছাড়াও পরীক্ষার একটা নৈতিক দিক আছে। সেই দিক থেকে প্রচলিত পরীক্ষা, শুধু অকেজো নয়, ক্ষতিকর। এই পরীক্ষা ছেলের প্রতিযোগিতার প্রবৃত্তিকে অযথা বাড়িয়ে দেয়। তাতে ছেলের ব্যক্তিত্বের এবং সমাজের দুইয়েরই ক্ষতি হয়। মানুষের মনে সৎ অসৎ দু রকমের প্রবৃত্তিই আছে। শিক্ষার কাজ হল মানুষের অসৎ প্রবৃত্তিগুলিকে দমন করা এবং সৎ প্রবৃত্তিগুলিকে বাড়ানো। তা না করে শিক্ষা যদি মানুষের অসৎ প্রবৃত্তি-গুলিকেই বাড়িয়ে দেয়, তা হলে বলতে হবে শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে। ছেলের মনে প্রতিযোগিতার প্রবৃত্তিও আছে, আবার সহযোগিতার প্রবৃত্তিও আছে। প্রতিযোগিতা হল সকলকে ছাড়িয়ে বড় হওয়া, আর সহযোগিতা হল সকলকে নিয়ে বড় হওয়া। শিক্ষার লক্ষ্য হবে ছেলের প্রতিযোগিতার প্রবৃত্তিকে দমন করা এবং সহযোগিতার প্রবৃত্তির বিকাশসাধন করা। এই পরীক্ষা কিন্তু ঠিক তার উল্টোটাই করছে। ছেলের সহযোগিতার প্রবৃত্তিকে না বাড়িয়ে প্রতিযোগিতার প্রবৃত্তিকেই বাড়াচ্ছে। এর ফলে আজ মানুষে মানুষে বিরোধ, দেশে দেশে বিরোধ, জাতিতে জাতিতে বিরোধ। চারিদিকে হানাহানি মারামারি কাটাকাটি। পৃথিবীতে যদি শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তা হলে এই প্রতিযোগিতার প্রবৃত্তি কমাতেই হবে এবং তার জন্য প্রচলিত পরীক্ষার পরিবর্তন করতেই হবে।

পরীক্ষা চাই কিন্তু বর্তমান আকারে চাই না। নূতন পরীক্ষা তা হলে কেমন হবে? কি করলে আমরা ভাল করে ছেলের যোগ্যতার পরিমাপ করতে পারব, অথচ তাতে ছেলের ব্যক্তিত্বের ক্ষতি হবে না?

এইখানে আর একটা কথা মনে রাখতে হবে। সাধারণ পরীক্ষায় ছেলের যে যোগ্যতার পরিমাপ করবার চেষ্টা করা হয় সে হচ্ছে তার লেখাপড়া-বিষয়ক যোগ্যতা। ছেলে কোন্ বিষয়ে কতখানি জ্ঞান লাভ করেছে বা কোন্ কাজ কতখানি শিখেছে এই মাত্র দেখা হয়। কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষায় আমরা ছেলের সর্বাঙ্গীণ বিকাশকেই লক্ষ্য বলে ধরে নিয়েছি। এখানে যোগ্যতার পরিমাপ করতে হলে শুধু লেখাপড়ার কথাই ভাবলে চলবে না। ছেলের শরীর, মন ও চরিত্রের বিকাশ কতখানি হয়েছে তা দেখতে হবে।

এই যে দেখা, এ দুদিন বা চার দিনের পরীক্ষায় সম্ভব নয়। এর জন্য চাই দীর্ঘদিন ধরে প্রতিদিনের সতর্ক পর্যবেক্ষণ। এই প্রসঙ্গে আমার আগের দিনের চতুষ্পাঠীর শিক্ষার কথা মনে হয়। সেখানেও আজ ইংরেজী স্কুলের পরীক্ষার চলন হয়ে গেছে এবং এই পরীক্ষার যে কুফল তা সেখানেও ফলতে আরম্ভ হয়েছে। সেইজন্য আমি বিশেষ করে আগেকার দিনের চতুষ্পাঠীর কথা বলছি। তখন একজন অধ্যাপকের কাছে বহু ছাত্র পড়ত। সকলকে পড়ানো তাঁর একার পক্ষে সম্ভব হত না। তাই ছাত্রকে দিয়ে ছাত্র পড়ানোর ব্যবস্থা ছিল। উপরের ছাত্রেরা নীচের ছাত্রদের পড়াত। অধ্যাপক নিজে উপরের ছাত্রদের পড়াতেন এবং নীচের ছাত্রদের পড়ানোর তত্ত্বাবধান করতেন। অধ্যাপকের চোখের সামনে উপরের ছাত্র নীচের ছাত্রকে পড়াত।

এই পড়ানোর ভিতর দিয়েই দিনের পর দিন তার শিক্ষার পরীক্ষা হত। নিজের শিক্ষা ভাল না হলে তো অপরকে পড়ানো যায় না। কাজেই কে কেমন পড়াচ্ছে তাই দেখেই সে কেমন শিখেছে তা জানা যেত। এইভাবে যে ছাত্র নিজের পড়া শেষ করে অন্য ছাত্রদের কৃতকার্যতার সঙ্গে পড়াতে পারত তারই শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে বলে গণ্য করা হত।

এইভাবের শিক্ষার ভিতর দিয়ে শুধু যে ছেলের বিদ্যার যাচাই হত তা নয়। প্রথম থেকেই অপেক্ষাকৃত ছোট সতীর্থকে সাহায্য করার ভিতর দিয়ে সহযোগিতার শিক্ষাও খুব ভাল করে হত। সমস্ত চতুষ্পাঠীটি ছিল একটি পরিবারের মত। সেই পরিবারের মধ্যে প্রত্যেকের সম্বন্ধেই প্রত্যেকের একটা দায়িত্ব ছিল। সেই দায়িত্ব পালনের ভিতর দিয়ে ছেলে লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্বের শিক্ষায় শিক্ষিত হত।

আজকার দিনেও যদি এই রকমেরই একটা কিছু করতে পারা যায় তো ঠিক হয়। শিক্ষক দিনের পর দিন ছেলের লেখাপড়া কাজকর্ম লক্ষ্য করে যাবেন এবং তার ভিতর দিয়ে তার দেহ, মন ও চরিত্রের কিরকম বিকাশ হচ্ছে এটাও দেখবেন। যা দেখবেন তার একটা লিখিত বিবরণ রাখবেন। এই বিবরণ থেকেই বছরের শেষে ছেলের যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যাবে এবং এরই উপর নির্ভর করে ছেলেকে উপরের শ্রেণীতে তুলে দিতে পারা যাবে কি যাবে না তা স্থির হবে। এইরকম একটা ব্যবস্থা করতে পারলেই ভাল হয়। অবশ্য প্রতিদিনকার বিবরণ রাখা সহজ কাজ নয়। একজন শিক্ষকের শিক্ষাধীনে ত্রিশটি ছেলে থাকবে। প্রতিদিন এই ত্রিশটি ছেলের বিবরণ রাখা শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব হবে না। তবে, একটা

সাপ্তাহিক বিবরণ রাখা চলতে পারে, যদিও তাও খুব সহজ হবে না।

এখন কিভাবে এই বিবরণ রাখা যাবে? বিবরণে বেশি কিছু লিখতে হলে অসুবিধা হবে। সুতরাং বিবরণটি সংক্ষিপ্ত হবে এবং তাতে ভাষার বাহুল্য থাকবে না, এই হলেই ভাল হয়। বিবরণের একটি নির্দিষ্ট ফরম থাকবে। সেই ফরমে ছেলের কাছে যেসব জ্ঞান বা যেসব কাজ আমরা প্রত্যাশা করি এবং ছেলের মধ্যে শরীর, মন ও চরিত্রের যেসব গুণ আমরা দেখতে চাই তার উল্লেখ থাকবে। এইসকল বিষয়ে ছেলের কৃতিত্বকে তিনটা চারটা বা পাঁচটা শ্রেণীতে ভাগ করা হবে এবং সেইসব শ্রেণীর পরিচায়ক 'ক' 'খ' প্রভৃতি এক-একটি চিহ্ন থাকবে। ফরমে প্রত্যেক সপ্তাহের জন্য একটি করে ঘর থাকবে। সপ্তাহের শেষে শিক্ষক সেই ঘরে বিভিন্ন বিষয়গুলির পাশে পাশে কৃতিত্বজ্ঞাপক চিহ্নগুলি বসিয়ে দেবেন। সপ্তাহের পর সপ্তাহ এইভাবে ফরমটি পূরণ করা হবে। পরে একটি ফরমে একবার চোখ বুলোলেই সেই ছেলের মোটামুটি একটা পরিচয় পাওয়া যাবে।

এ ছাড়াও আর একটা কাজ করা যেতে পারে। এটা অপেক্ষাকৃত সহজ। যেখানে সাপ্তাহিক বিবরণ রাখা সম্ভব হবে না সেখানে এই ব্যবস্থা করতে হবে। যেখানে সাপ্তাহিক বিবরণ রাখা হবে সেখানেও অতিরিক্ত ব্যবস্থা হিসাবে এটা করতে পারলে ভাল হয়।

আমাদের একটি স্কুলে আমরা এই ব্যবস্থা করেছি। বছর শেষ হবার পূর্বে ছেলেদের উৎসাহিত করে একটু বেশি খেটে যা ত্রুটি আছে আমরা সংশোধন করিয়ে নেবার চেষ্টা করি।

বছরের প্রগতি কত হবে তা আগে থেকেই ঠিক করা থাকে। খানিকটা ছেলেদের সঙ্গে পরামর্শ করেই সেটা স্থির করা হয় এবং ছেলেরা সেটা জানে। বছর শেষ হবার এক মাস আগে নির্ধারিত প্রগতি সম্বন্ধে ছেলেদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়। পরের বছর নূতন শ্রেণীতে উঠতে হবে, সেখানে আরও বেশি কাজ করতে হবে। তার জন্য তৈয়ারি হতে হলে এবারকার কাজ শেষ করা দরকার। শ্রেণীর সব ছেলেকেই করতে হবে। সুতরাং যারা পিছিয়ে আছে তারা একটু বেশি খেটে কাজ করবে এবং যারা এগিয়ে আছে তারা তাদেব সাহায্য করবে। তবেই শ্রেণীর সব ছেলে এগিয়ে যেতে পারবে। এইভাবে আলোচনা করে ছেলেদের একটু জোরে কাজ করবার জন্য উৎসাহিত করা হয় এবং কিভাবে এই এক মাস কাজ হবে ছেলেদের সহায়তায় তার এক পরিকল্পনা করা হয়। এক-একজন অগ্রবর্তী ছেলেকে এক বা একাধিক পশ্চাদ্‌বর্তী ছেলের ভার দেওয়া হয়। শিক্ষক প্রয়োজন মত সকলকেই সাহায্য করবার জন্য প্রস্তুত থাকেন। আমরা দেখেছি, এক মাসের জোর কাজের ফলে অনেক ছেলেই এগিয়ে যায়। সমবেতভাবে শ্রেণীর কাজের উন্নতি হয়, এবং সকলেই সকলকে সাহায্য করে বলে এর ভিতর দিয়ে পরস্পর সহযোগিতার ভাবটাই বাড়ে।

এই যে এক মাসের জোর কাজ, এটাকে আমরা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারি। আগে আমরা ছেলেদের কোন বিবরণ রেখে থাকি আর নাই থাকি, এই একটা মাসের বিবরণ আমরা রাখতে পারি। এই এক মাস প্রতি সপ্তাহে ছেলে দেহ, মন ও চরিত্রের দিক থেকে কিভাবে অগ্রসর হচ্ছে তার হিসাব রেখে, সেই হিসাব দেখে ছেলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল কি না এবং

তাকে উপরের শ্রেণীতে তুলে দেওয়া চলবে কিনা ঠিক করা যেতে পারে। এখানে মাসের শেষে ছেলে কোথায় গিয়ে পৌঁছল এও যেমন দেখা হবে, তেমনই ছেলের গতির হার কেমন, এক সপ্তাহ থেকে আর এক সপ্তাহে সে কি হারে এগিয়েছে তাও দেখা হবে। এই একমাসের পরিকল্পনায় যথাসম্ভব সবরকম কাজেরই স্থান রাখতে হবে। তা হলে এর থেকে ছেলের একটা সর্বাঙ্গীণ পরিচয় পাওয়া যাবে এবং তার উপরে নির্ভর করলে খুব বেশি ভুল করা হবে না। সাধারণ পরীক্ষার কুফলও এতে অনেকখানি এড়ানো যাবে। সুবিধা হলে বছরে একবারের জায়গায় ছমাস অন্তর একবার করে বছরে দুবারও এইরকম জোর কাজের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।